স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী

১ম বর্ষ ❑ ৩য় সংখ্যা ❑ ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০১২

সম্পাদক

ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক

ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ❑ ডা. সোহম সরকার
ডা. তাপস মণ্ডল

অক্ষরবিন্যাস ❑ প্রজ্ঞা প্রকাশনী

প্রচ্ছদ ও বিন্যাস ❑ মনোজ দে

বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক

স্বাস্থ্যের বৃত্ত
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রণ

এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ২

চিঠিপত্র ৫৪

শরীর

বেশি বয়সে হাড় ভাঙ্গলে..... ❑ ডা. বিশ্বজিৎ সরকার ৩
চুল পড়ার কুটকচালি ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ৫
অ্যাপেন্ডিসাইটিস : বর্তমান যুগের এক সাধারণ রোগ ❑ ডা. বিজন কুমার টুডু ও ডা. বিতান কুমার দত্ত ৭
চেনা ওষুধ অচেনা কথা ❑ ডা. পুণ্যব্রত গুণ ৯

শরীর–সমাজ–চিকিৎসা

মেয়েদের বয়ঃসন্ধির কিছু কথা ❑ ডা. রথীন রায় ১১
মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া--- প্রতিকার কি সম্ভব? ❑ ডা. কাঞ্চন মুখার্জী ১৫
শিশুর খাবার--- দু'বছর পর্যন্ত ❑ ডা. অতনু ভদ্র ১৭

মন

শিক্ষাগ্রহণে অক্ষমতা--- Learning Disability ❑ জয়তী অধিকারী ১৯
আমার বড় হয়ে ❑ ওঠা সায়ন্তন বোস ২১

অন্তর–দৃষ্টি

রোগ ধরার যন্ত্র কতটা নিরাপদ ❑ ডা. প্রদীপ সাহা ২৩

স্মরণে

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ পবন মুখোপাধ্যায় ২৫

শরীর ঘিরে রাজনীতি

'মিতানিন'- এর মায়াকল্প ❑ ডা. বিনায়ক সেন ২৭
আশা রাখি পেয়ে যাব বাকি দু- আনা ❑ আশুতোষ বিশ্বাস ৩৩
পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য : পরিবর্তন কি 'প্রত্যাবর্তন'- এর পথে? ❑ অমিতাভ চক্রবর্তী ৩৫
জীন পরিবর্তিত খাদ্যের কথা ❑ ড. শুভাশিস মুখোপাধ্যায় ৩৮

গল্প

ল্যাংড়া পাঁচুর জীবনদর্শন ❑ আশীষ কুমার কুণ্ডু ৪৩
রাগ ❑ মন্দাক্রান্তা সেন ৪৫

চলচ্চিত্রে ডাক্তার

হাটে বাজারে ডাক্তার মুখার্জি ❑ অংশুমান ভৌমিক ৪৭

বই–পড়া

আরোগ্য- নিকেতন--- চিকিৎসা- ব্যবসায়, নাড়ী- বিদ্যা, আধুনিক চিকিৎসা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক সংগ্রাম ❑ ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য ৫০

হালকা চালে

কুইজ মাস্টারের সামনে ❑ অভিষেক দাস ৮

সম্পাদকীয়

আমরি হাসপাতাল ও চিকিৎসায় নৈতিকতা

ঢাকুরিয়ার AMRI হাসপাতালে অগ্নিকান্ডে ৯৩ জন মানুষ মারা গেলেন। তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের পরিজনের প্রতি সহমর্মিতা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। হাসপাতালে যাঁরা এসেছিলেন প্রাণে বাঁচতে হাসপাতাল তাঁদেরই প্রাণ কেড়ে নিল।

আগুন লাগা একটি খুব সাধারণ দুর্ঘটনা, তার জন্য যে কোনো হাসপাতালেই উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখার কথা। আমরি হাসপাতালে সে ব্যবস্থা ছিল না। দমকল বিভাগ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করেছিলেন, কাজ হয়নি। দাহ্য পদার্থ পড়েছিল হাসপাতালে বিভিন্ন জায়গায়, সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নজর দেন নি। দিনের পর দিন অগ্নি-সতর্কতা ব্যবস্থা অকেজো করে রাখা হত। কর্মচারীদের আগুন নেভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া আইনত বাধ্যতামূলক হলেও তা কোনোদিনই দেওয়া হত না।

বাতানুকূল রোগীদের ঘরগুলি পুরু কাঁচের দেওয়াল দিয়ে আবদ্ধ ছিল, জানলা খোলার ব্যবস্থা ছিল না। তাই বাতানুকূল যন্ত্রেরই বাতাস আসার নালী বেয়ে ধোঁয়া আর বিষাক্ত কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস এসে শয্যাশায়ী রোগীদের ওপর যখন পড়ল তখন তাঁদের বাঁচার পথ ছিল না। সময়ে পুলিশে বা দমকলে খবর পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজেরা কিছু করেন নি, উপরন্তু স্থানীয় বাসিন্দা থেকে দমকল— সবার কাজে বাগড়া দিয়েছেন।

রাজ্য প্রশাসন যথাযথ দ্রুততার সঙ্গে মৃতদের ময়না-তদন্ত করে শোকতপ্ত পরিবারগুলিকে হয়রানির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন এবং তা টিভি-তে প্রদর্শিত হয়েছে। আমরা গাফিলতি দেখতে এতোই অভ্যস্ত যে যথাসময়ে কাজ হবে এটা আশা করিনা, তাই এই কর্তব্যপালনকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি।

এ পর্যন্ত ঘটনা সবার জানা। প্রশ্ন ওঠে তারপর। এটাকে 'মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি' বলা ঠিক নয়, কারণ সত্যি ঘটনা না জানতে পারলে জনসাধারণ কি করে নিশ্চিন্ত হবে যে আর কোনোদিন কোনোখানে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না?

আমরি হাসপাতাল হল আমাদের রাজ্যে পি পি পি অর্থাৎ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে চালানো প্রথম হাসপাতাল। সরকারী হাসপাতাল-গুলিতে ভাল কাজের পরিবেশ নেই, সেগুলি দিয়ে জনসাধারণকে উন্নত পরিষেবা দেওয়া অসম্ভব, তাই পি পি পি মডেল। বলা হল বেসরকারী হাসপাতালে পয়সা দিয়ে ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে, আর সেখানে গরিব রোগীরও চিকিৎসার কিছু ব্যবস্থা থাকবে। সরকারী হাসপাতালে কেন ভাল চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয় তা যদিও বোঝা গেল না, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই এটা বোঝা গেল যে দামি পি পি পি হাসপাতালে গরিব রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি।

তবে সেসব দামি হাসপাতালেও যে ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও থাকবে না সেটা আমরি-র অগ্নিকান্ডের আগে বোঝা যায় নি। সরকারী হাসপাতালগুলিতেও অগ্নি-সুরক্ষার বালাই নেই— মেডিকেল কলেজ বা এন আর এস বা পি জি হাসপাতাল সর্বত্রই আগুন লাগলে রোগীদের জন্য আমরি-র দুর্ভাগ্যই অপেক্ষা করছে।

হাসপাতালের সমস্যা বা চিকিৎসার সমস্যা কেবল একটি আর্থিক বা প্রযুক্তিগত সমস্যা নয়। তাই পয়সাকড়ি ছড়িয়ে আর চোখ-ধাঁধানো চাকচিক্য দিয়ে এই সমস্যাকে দূর করা যাবে না। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা-পরিষেবা, আর বাঁচার অধিকার এমন মৌলিকভাবে জড়িয়ে আছে যে শেষ বিচারে চিকিৎসার সমস্যা একটি নৈতিক সমস্যা। মানুষের জন্য কাজ করা আর কেবল টাকার জন্য কাজ করা— এ-দুয়ের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো অসাধ্য কাজ।

কোনো ব্যবসায়ী, কোনো ব্যবসাবুদ্ধির চিকিৎসক, কোনো টিভি ফুটেজের জন্য লালায়িত রাজনীতিবিদ নন, কেরালা থেকে আগত আমরি-র যে দুই নার্স ওই রাতে রোগীদের বাঁচাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা আমাদের নৈতিকতার শিক্ষক হোন।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনো পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

- **বাণিজ্যিক নয়— চিকিৎসা হোক মানবিক**
- **স্বাস্থ্যের বৃত্তে : চিকিৎসার মানবিক মুখের সন্ধানে চেনা স্বপ্ন, অচেনা পথ**

বেশি বয়সে হাড় ভাঙ্গলে.....

প্রযুক্তির অনেক উন্নতি হচ্ছে— নিয়ত হয়েই চলেছে। আগেকার দিনে বৃদ্ধবয়সে হাড় ভাঙ্গলে সবাই ধরে নিতেন ও আর সারবার নয়। কিন্তু বাস্তব চিত্র এখন অন্য কথা বলে— লিখেছেন **ডা. বিশ্বজিৎ সরকার।**

পুলকের মায়ের বয়স ৭২, গ্রামের বাড়িতে একা থাকেন। খবর এল ভোরে ফুল তুলতে গিয়ে পিছলে পড়ে কুঁচকির হাড় ভেঙ্গেছে। মা'কে গ্রামের বাড়ি থেকে অ্যাম্বুলেন্সে সোজা আমার কাছে নিয়ে এসে পুলক কেঁদে পড়ল— ''মা কি আর কোনোদিন হাঁটতে পারবে না?''

এটাই সাধারণভাবে মানুষের ধারণা। বেশি বয়সে হাড় ভাঙ্গলে আর আগের মত স্বাভাবিক হবে না। বেশি বয়স অর্থাৎ ৭০ বছরের পর কব্জির হাড় (Wrist or Distal radius) ভাঙ্গা আর কুঁচকির হাড় ভাঙ্গা (Per-Trochanteric and Inter-Trochanteric fracture of the Femur) সাধারণত বেশি দেখা যায়।

এক্স-রে ছবি দিয়ে ব্যাপারটা অনেকটা বোঝা যাবে। ওপরের চারটে এক্স-রে ছবি একই হাতের। ২ নং ছবির একদম ডানদিকে একটু নীচের দিকটা দেখুন— হাড়ের একটা টুকরো যেন চাকলা হয়ে আলাদা হয়ে পড়েছে। ওটা ভাঙ্গা হাড়। ৩ ও ৪ নং ছবিতে দেখুন— ভাঙ্গা হাড় সেট করা হয়েছে। যেটা ছবি দেখে পুরো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু একটু আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তা হল হাতটা পুরো সোজা হয় নি, খানিকটা বেঁকে আছে, ও কব্জির স্বাভাবিক গঠন বা Anatomy পালটে গেছে। এই হাতে পুরো স্বাভবিক কাজকর্ম সম্ভব হয়না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বয়স্ক মানুষের এই অবস্থা তথা Disability পরিবারের বাকিরা মেনে নেয় এই

(৫) নং ছবি থেকে (৭) নং ছবিতে এরকম এক ভাঙ্গা হাত আধুনিক পদ্ধতিতে (Ligamento-taxis & percutaneous fixation) চিকিৎসা কিভাবে করা হল তা এক্স-রে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। অপারেশন থিয়েটারে C-Arm-এ দেখে না কেটে এই অপারেশন করা হয়। আর (৮) নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে অপারেশনের পরেকার ছোটো একটি ক্ষত— ব্যান্ডেজে ঢাকা। এভাবে অপারেশন করলে হাড় জুড়ে যাওয়ার পর হাতের গঠন স্বাভাবিক হয়ে যায়। এই অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় C-Arm যন্ত্রটির ছবি পরে দেওয়া আছে (চিত্র ১২)। C-Arm যন্ত্রটিতে কমজোরি এক্স-রে দিয়ে চামড়া ও মাংস

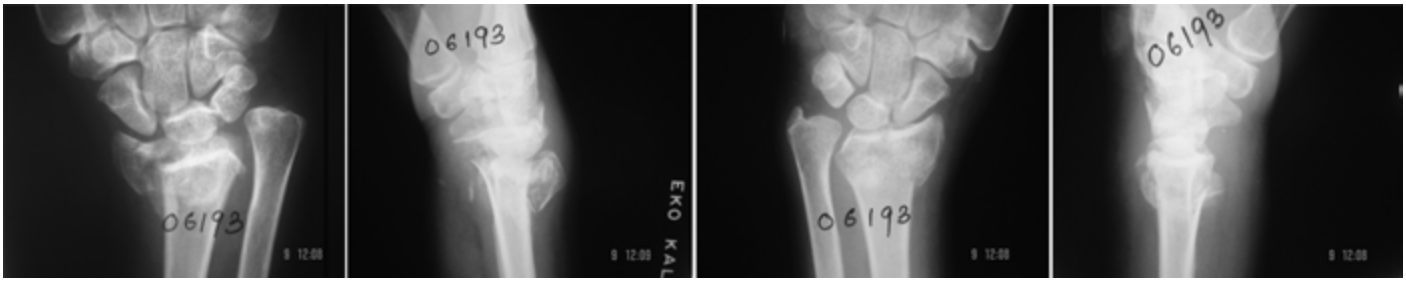

১ ২ ৩ ৪

৫ ৬ ৭ ৮

কব্জির হাড় ভাঙ্গা: প্রথমে আসি কব্জির ভাঙ্গা প্রসঙ্গে। সাধারণত পা পিছলে পড়ার সময়ে দেহের পতন ঠেকানোর জন্য হাতটা যেন আপনা থেকেই সামনে চলে আসে, যাকে বলে রিফ্লেক্স অ্যাকশন। তাই তারপর মানুষটি যখন পড়েন তখন হাতের ওপর শরীরের সমস্ত ওজন গিয়ে পড়ে। আর তাতেই এই হাত ভাঙ্গা। এই ভাঙ্গার সঠিক চিকিৎসা না হলে হাতের স্বাভাবিক নড়াচড়া (movement) ও কাজকর্ম ব্যাহত হয়।

বলে, ''এই বয়সে আর কি হবে''।

আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থায় এটা মেনে নেওয়া যায় না যে বয়স হয়েছে বলেই কারও ভালোভাবে বাঁচার অধিকার নেই। আধুনিক অবেদন (Anaesthesia) এত উন্নত যে শুধু বয়সের কারণে কোনো সমস্যা হয় না। সুতরাং মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। বেশি কাটা ছেঁড়া না করেই এই ভাঙ্গা হাড় অনেক ভালভাবে চিকিৎসা করা যায়।

ভেদ করে যেখানে হাড় ও তার সঙ্গেকার দড়ির মত অস্থিরজ্জু (লিগামেন্ট)-র ওপর অপারেশন করা হচ্ছে সেই জায়গাটা কম্পিউটারের পর্দার মত একটি পর্দায় দেখতে পাওয়া যায়। অর্থোপেডিক সার্জেনের উপযুক্ত ট্রেনিং থাকলে C-Arm যন্ত্রের সাহায্যে নানা রকমের অপারেশন করতে অনেক সুবিধা হয়। তবে সমস্যা হল যন্ত্রটি দামী, ফলে অপারেশনের খরচ কিঞ্চিৎ বাড়তে পারে। এবং এই দরিদ্রদেশে অনেক মানুষ এই বাড়তি পয়সাটা

৯

১০

১১

১২

১৩

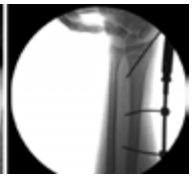
১৪

যোগাড় করে উঠতে পারেন না। যে সমস্ত সরকারী হাসপাতালে অর্থোপেডিক অপারেশন হয় সে সব হাসপাতালে এই যন্ত্র ও তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নেই— থাকলে বহু মানুষ উপকৃত হতেন। তবে যন্ত্র দিয়েই সবকিছু হয় এমন ভাবা ভুল— যে ডাক্তারবাবু অপারেশন করছেন তাঁর দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একজন দক্ষ ও যত্নশীল ডাক্তার সাধারণ যন্ত্রপাতি নিয়ে পুরোনো কায়দাতেই যতটা উপকার করতে পারবেন একজন কম দক্ষ ডাক্তার সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়েও ততটা করতে পারবেন না।

(৯), (১০) ও (১১) হল অপারেশনের পরের ছবি। এই-ছবি দেখে এটা পরিষ্কার যে ভাঙ্গার দেখছেন চিত্র (১২) তে। আর (১৩) নং ও (১৪) নং চিত্রে অপারেশনের দুটি অবস্থা দেখানো হয়েছে।

কুঁচকির হাড় ভাঙ্গা: এই রকম আরেকটি অবস্থা হল কুঁচকির হাড় ভাঙ্গা (Per-Trochanteric and Inter-Trochanteric fracture of the Femur)। চিত্র (১৫) তে এই হাড় ভাঙ্গার এক্স-রে দেখানো হয়েছে। কুড়ি বছর আগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ট্রাকশান (Traction) দিয়ে চিকিৎসা হত। বয়স্ক মানুষেরা প্রলম্বিত চিকিৎসা চলতে চলতে প্রায়ই হতাশ হয়ে পড়েন, এমনকি বাঁচার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেন। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক মানুষেরা এই ট্রাকশান দিয়ে চিকিৎসা সহ্য করতে পারতেন না এবং বিভিন্ন মেডিক্যাল সমস্যার ফলে মারা যেতেন। যাঁরা বেঁচে থাকতেন ফিরে যেতে পারেন। এখানেও আধুনিক অবেদন (অ্যানাস্থেসিয়া) পদ্ধতিতে কেবল পা-টিকে অবশ করে C-Arm যন্ত্রের সাহায্যে দেখে এই অপারেশন করে দেওয়া— চিত্র (১৬), (১৭), (১৮) দেখুন।

মানুষের মনে যে ভুল ধারণা আছে— "এই বয়সে আর হাড় জোড়া লাগবে না" সেটাও ঠিক নয়। এই অপারেশন, যাকে আমরা সংক্ষেপে D H S অপারেশন বলি, তার পরে ভাঙ্গা হাড় জুড়ে মানুষ আবার স্বাভাবিক মত চলাফেরা করতে পারেন, ঠিক যেন আগের মতই— চিত্র (১৯) দেখুন।

বিজ্ঞানের আশীর্বাদ থেকে যেন এই বয়স্ক মানুষেরা বঞ্চিত না হন, আর দশজনের মত স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার যেন

১৫

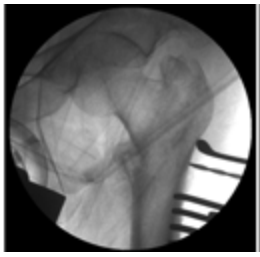
১৬

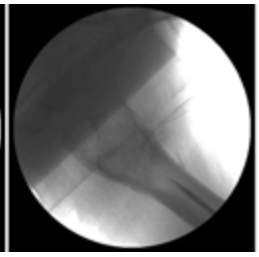
১৭

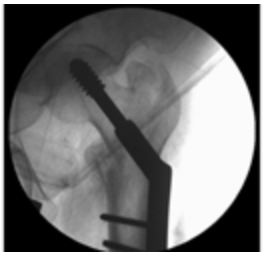
১৮

১৯

আগের অবস্থায় অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় হাতকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। হাড় জুড়ে যাবার পরে হাতের গঠন একদম আগের মত হয়ে যায়। ইনি হাতটা নিয়ে ঠিক আগের মতই মর্জিমাফিক নাড়াচড়া করতে পারছেন।

অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় C-Arm যন্ত্রটি তাঁদের অনেকেরই স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করার ক্ষমতা থাকত না। বর্তমানে অর্থোপেডিক অপারেশনের উন্নতির ফলে যে কোনও বয়সে অপারেশন করে চিকিৎসা করা যায় ও অপারেশনের এক মাসের মধ্যেই আবার চলাফেরা করা সম্ভব— ফলে অতি দ্রুত বয়স্ক মানুষেরা স্বাভাবিক জীবনে তাঁদেরও থাকে।

শেষে আবার প্রথমে বলা কাহিনীর খেই ধরে বলি, পুলকের দুশ্চিন্তা দূর হয়েছিল। অপারেশনের পর ওর মা আবার নিজের গ্রামের বাড়িতে আগের মত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়েছিলেন।

- বেশি বয়সে কব্জির হাড় আর কুঁচকির হাড় (femur) সহজেই ভাঙে।
- প্রচলিত ধারণা এই বয়সে ভাঙা হাড় ঠিকভাবে জোড়া লাগবে না। এটি ভুল ধারণা।
- অর্থোপেডিক অপারেশনের নতুন প্রযুক্তি ও অ্যানাস্থেসিয়ার উন্নতির ফলে এখন এর চিকিৎসা আগের থেকে ভালো হয়েছে।
- আর্থিক কারণে ও সরকারি হাসপাতালে ব্যবস্থা না থাকায় সবাই এই উন্নতির সুফল পাচ্ছেন না— তা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার।

লেখক পরিচিতি: ডা. বিশ্বজিৎ সরকার, এম বি বি এস, ডি অর্থো, অর্থোপেডিক সার্জেন, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

চুল পড়ার কুটকচালি

প্রথমে চুল পড়ে। তারপর টাক পড়ে। সেই টাক পড়ার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে লিখেছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস।**

সেক্সপীয়র, গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্রসহ অতীত ও বর্তমানের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির কেশাল্পতা তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু সব মানুষে তো আর অমন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন না, আর মাথাভরা ঘন কালো চুল চিরদিনই মানুষের সৌন্দর্যের একটি প্রধান মাপকাঠি। তাই ২৮ বছরের পাঁচ অঙ্কের মাইনে পাওয়া ইঞ্জিনিয়ার যুবকটি প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে— মাথার চওড়া টাকের জন্য তার বিয়ে ভেস্তে যাচ্ছে— তার হীনমন্যতার জন্য তাকে আর দোষ দিই কি করে?

নিজের চুলের ঘনত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট এমন মানুষ খুব কমই আছে। প্রতিদিন স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট জীবন চক্র শেষ করে কিছু পুরোনো চুল পড়ে যায় আর নতুন চুল গজায়, তবু সব মানুষকেই সবসময় বলতে শোনা যায়— ''কি চুল উঠছে! মাথা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল''। কিন্তু সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে মাথা একেবারে ফাঁকা কখনোই হয় না। মাথার ত্বকের লোমকূপের কোন সমস্যা, কেশদন্ডের কোন রোগ বা শরীরের আভ্যন্তরীণ কোন সমস্যা থেকেই মাথা একেবারে ফাঁকা হয়, যাকে চলতি ভাষায় 'টাক পড়া' বলে।

টাকের ব্যাপারে বুঝতে গেলে চুলের গোড়ার কথা একটু জানতে হবে। জন্মের সময় মানুষের মাথার ত্বকে ১ লাখ মত চুলের গোড়া (hair follicle) থাকে। একটি চুলের জীবনচক্রের তিনটি দশা থাকে— অ্যানাজেন, ক্যাটাজেন ও টেলোজেন। অ্যানাজেন হল নতুন চুলের বেড়ে ওঠার সময়— এর স্থায়িত্ব তিনবছরের বেশি। এরপরে ২-৪ সপ্তাহের একটা স্বল্পস্থায়ী পর্যায় হল ক্যাটাজেন। তারপরে ৩-৪ মাসের টেলোজেন দশা শেষ করে চুলটি পড়ে যায়। আবার নতুন চক্রের চুল এসে শূন্যস্থান পূরণ করে। মাথার বিভিন্ন চুল সবসময় বিভিন্ন দশায় থাকে বলে একসঙ্গে মাথা কখনো একেবারে ফাঁকা হয়ে যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানাজেন দশার সময় কমে এবং দুটি চক্রের মধ্যবর্তী সময় বাড়ে, ফলে রূঢ় বাস্তব হল ৫৬ বছরের প্রৌঢ়ার আশা করা উচিত নয় তাঁর ১৬ বছর বয়সের মতই চুলের ঘনত্ব বজায় থাকবে। কোন শারীরিক ব্যাধি ছাড়াও চুলের ঘনত্ব ব্যাপারটা প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে আলাদা। সাধারণত যে কোন বয়সেই শতকরা মোটামুটি ৯০ ভাগ অ্যানাজেন ও ১০ ভাগ টেলোজেন চুলে থাকার কথা। এই অনুপাতও আবার ঋতু বিশেষে বদলায়।

চুল চক্রের কোন গণ্ডগোল ধরতে গেলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কেশদণ্ডগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হয়— যাকে বলে একেবারে চুলচেরা বিচার। কোন যন্ত্রপাতি ছাড়া আর একটা সোজা উপায়েও চুলের অস্বাভাবিকতা নির্ণয় করা যায়— ৩ থেকে ৮ বার যদি মাথার বিভিন্ন জায়গা থেকে এক গোছা (৫০-১০০টি) চুল টেনে পরখ করা হয়— স্বাভাবিক অবস্থায় ৩-৫টির বেশি চুল কখনোই উঠে আসবে না। চুল নিয়ে অতিশঙ্কিত পাঠকবৃন্দ আবার নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে বসবেন না যেন!

অস্বাভাবিক চুল পড়াকে ডাক্তারি পরিভাষায় অ্যালোপেসিয়া (alopecia) বলা হয়। এই অ্যালোপেসিয়া বিভিন্ন ধরনের হয়—

অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া

শুরুতেই যে ছেলেটির কথা বলেছিলাম এবং যত্রতত্র পথেঘাটে আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে যে অ্যালোপেসিয়া নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা শোনা যায় তা হল— অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া বা পুরুষসুলভ টাক পড়া। এই অ্যালোপেসিয়াতে একটা বিশেষ আকৃতিতে মাথা ফাঁকা হতে শুরু করে। প্রথমে চুল উঠে কপালের দু-ধার প্রশস্ত হয়ে যায়। তারপরে মাথার ওপরের দিকটার চুল উঠে যায়। এক্ষেত্রে অ্যান্ড্রোজেন নামক হরমোন দ্বারা চুল ওঠা প্রভাবিত হয়। জন্ম থেকেই মাথার ত্বকের কোন কোন চুল অ্যান্ড্রোজেন দ্বারা প্রভাবিত হবে আর কোন কোন চুল হবে না তা নির্দিষ্ট থাকে। এই প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারটাও আবার কিছুটা বংশগত। ''সেই যে মাথায় ওই তেলটা মাখলাম— তারপরই সব চুল উঠে গেল'' এই ধরনের আক্ষেপ প্রায়ই শোনা যায় কিন্তু তা ভিত্তিহীন।

মাথার উপরিভাগে, কপালের দুপাশে, মাথার পেছনদিকের চুলের গোড়ায় অ্যান্ড্রোজেন সংবেদক (Receptor) উপস্থিত থাকে। বয়ঃসন্ধির পরে যখন অ্যান্ড্রোজেনের মাত্রা বাড়তে থাকে তখন কোনও কোনও পুরুষের ওইসব অঞ্চলের চুলের গোড়া ক্রমশঃ ছোট ও সংকুচিত হতে হতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে সেই লোমকূপের আর কেশদন্ড তৈরি করার ক্ষমতা থাকে না।

অ্যান্ড্রোজেনে প্রভাবিত চুল ওঠার চিকিৎসায় প্রথম বিপ্লব ঘটে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে, যখন দেখা গেল প্রেসার কমানোর ওষুধ মিনোক্সিডিল খেলে রোগীদের গায়ের লোম ও চুল বেড়ে যাচ্ছে। মিনোক্সিডিলের এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেই দেখা গেল এই ওষুধ মাথার টাক-আক্রান্ত অঞ্চলে লাগালে চুল গজাতেও সাহায্য করে আবার শরীরের অভ্যন্তরেও বিশেষ কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না। তারপর থেকেই অ্যান্ড্রোজেন-প্রভাবিত অ্যালোপেসিয়ায় ২% বা ৫% মিনোক্সিডিল দিনে দুবার করে লাগাতে বলা হয়। ৪-৬ মাস পর মোটামুটি ও এক বছর লাগানোর পর এর পুরো ফল বোঝা যায়। মিনোক্সিডিল দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে মুখে লোমের আধিক্য দেখা যেতে পারে। অনেকসময় স্থানীয় ত্বকে চুলকানিও হয়। মিনোক্সিডিল লাগানোর সঙ্গে ফেনেস্টেরাইড নামের ওষুধ খেলে পুরুষদের

ক্ষেত্রে খুব ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। তবে খুব অল্প কিছু ক্ষেত্রে ওষুধটি খাওয়াকালীন সাময়িক কিছু যৌন সমস্যা দেখা যায়।

মহিলাদের অ্যান্ড্রোজেন-প্রভাবিত অ্যালোপেসিয়ায় মিনোক্সিডিল ২% লাগানো হয়। অনেক সময় অ্যান্টি-অ্যান্ড্রোজেন ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। ডাক্তারবাবু চুল ওঠার মাত্রা বিবেচনা করে নির্দেশ দিলে তবেই এই ওষুধ খাওয়া উচিত। অ্যান্ড্রোজেন-প্রভাবিত অ্যালোপেসিয়ায় এইসব চিকিৎসাতে যে ফল পাওয়া যায় তা কিন্তু কিছুটা সাময়িক। এবং যতদিন ওষুধ চলে ততদিনই কেবল ওষুধের প্রভাবে গজানো চুল মাথায় থাকে— তারপর ওষুধ বন্ধ করলে ওই চুল ঝরে পড়ে যায়।

চুল ট্রান্সপ্ল্যান্ট কখন করাবেন?

এবার আসা যাক এই ধরনের চুল ওঠার বিশেষ কিছু পরিস্থিতির মোকাবিলার কথায়। কোনও চিকিৎসাতেই রোগী সন্তুষ্ট হচ্ছেন না অর্থাৎ ঠিকমত চুল গজাচ্ছে না, মাথা ভরা টাক তাকে এমনই মানসিকভাবে বিব্রত করছে যে তার দৈনন্দিন কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। আর টাকের সঙ্গে তার ট্যাঁকের জোরের ছন্দও মিলছে অর্থাৎ টাক যুক্ত রোগীটি যথেষ্ট অর্থবান— তাহলে আধুনিক শল্য-চিকিৎসার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। চুল প্রতিস্থাপন পদ্ধতি (hair transplantation) এইসব টাকের চিকিৎসায় পরিবর্তন এনেছে। মাথার একদম পেছন দিকের ত্বকের চুল অ্যান্ড্রোজেন দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তাই বিশেষজ্ঞ দ্বারা ওই অঞ্চলের চুলের গোড়াশুদ্ধ ত্বক তুলে এনে যদি টাকপড়া জায়গাতে প্রতিস্থাপন করা যায়— নতুন জায়গায় ওই চুল বাড়তে থাকে এবং ঝরে পড়ে না। দু-রকমের প্রতিস্থাপন— ছোটো ও অণু। ছোটো প্রতিরোপণে ১.৫-২.৫ মি.মি. আকারের লোমকূপসহ ত্বক দাতা অঞ্চল থেকে তুলে গ্রাহক অঞ্চলে প্রতিরোপণ করা হয়। অণুপ্রতিরোপণে (micrograft) ১টি বা ২টি চুল প্রতিরোপণ করা হয়। অণুপ্রতিরোপণে সুবিধা বেশি কারণ যেখানে রোপণ করা হবে সেই অঞ্চলে বেশি কাটাকাটি করতে হয় না, ছোট ছিদ্র দ্বারাই রোপণ করা যায়। প্রতিরোপণ পদ্ধতি ক্রমেই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তবে খরচ এখনো সাধারণ লোকের নাগালের বাইরে। তবু সৌন্দর্যের খাতিরে অনেক মানুষ এখন সাধ্যের বাইরে খরচ করতেও পিছপা হন না। এই সাধ্যের বাইরে খরচ করে যাঁরা টাকে চুল প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁদের একটু ভেবে দেখে নেওয়া উচিত যে ভবিষ্যতে জীবনের ঝুঁকি আছে এরকম কোন রোগের জন্য যদি খরচসাপেক্ষ কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, সে পুঁজি আছে তো? থাকলে তবেই টাক ঢাকার জন্য এগোবেন, নচেৎ নয়।

শেষ কথা

তার মানে কি সব টাক একরকম? সবই কি ঐ অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া? না, তা কিন্তু নয়। এছাড়াও হাজার কারণে চুল পড়তে পড়তে ইন্দ্রলুপ্ত হতে পারে। সেগুলোর কিছু কিছু স্থানীয় অসুখ, অর্থাৎ একান্তই চুলের সমস্যা— যেমন অ্যালোপেসিয়া এরিয়েটা বা অ্যালোপেসিয়া টোটালিস, আবার কেউ কেউ শরীরের বেশ বড়োসড়ো রোগের লক্ষণমাত্র, যেমন থাইরয়েডের রোগে চুল উঠতে উঠতে মাথা ফাঁকা হয়ে যায়, টাক পড়ে সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমেটোসাস নামে এক মারাত্মক রোগেও। আবার কিছু ক্ষেত্রে (স্থানিক) টাক পড়া হল মানসিক রোগের প্রকাশ যেমন— চুল ছেঁড়ার বাতিক বা ট্রাইকোটিলোম্যানিয়া।

সুতরাং আপনি যদি মনেও করেন চুল নিয়ে মাথাব্যাথা করবেন না, তবু চুল যদি দ্রুত পড়ে, বা অসময়ে বেশি চুল পড়ে, তবে কিন্তু আপনার একবার ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়াটাই ভালো। বলা যায় না, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপই বেরোয়!

তবে তার সম্ভাবনা খুব বেশি নয় এটাই যা ভালো খবর।

- টাক পড়ার সবচেয়ে সাধারণ ধরণ হল পুরুষ-সুলভ টাক বা অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া।
- পুরুষ-সুলভ টাক হয় হরমোনের প্রভাবে, এবং নারীদেরও অনুরূপ কারণে চুল উঠতে পারে।
- পুরুষ হোক আর নারী, ওষুধ দিয়ে চিকিৎসায় অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়ায় ভাল ফল হয়। তবে ওষুধগুলি দামী, এবং যতদিন ওষুধ ব্যবহার করা হয় ততদিনই কেবল চুল পড়া আটকায়।
- কেবল সীমিত কিছু ক্ষেত্রেই ব্যয়বহুল হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সার্জারি দরকার।
- অন্যান্য কারণে চুল পড়া থেকে পুরুষ-সুলভ টাক পড়াকে আলাদা করতে ডাক্তারের পরামর্শ প্রয়োজন।
- আচমকা অনেক চুল পড়া শরীরে অন্য রোগের লক্ষণ হতে পারে—ডাক্তার দেখান।

লেখক পরিচিতি : ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এম বি বি এস, ডি ভি ডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে একটি সরকারি হাসপাতালে চর্মরোগ বিভাগে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

অ্যাপেন্ডিসাইটিস : বর্তমান যুগের এক সাধারণ রোগ

আচমকা পেটব্যথা— সে ব্যথা বাড়তে বাড়তে রোগী ছটফট করে। ডাক্তার এসে পেটে হাত দিয়ে বলেন— অ্যাপেন্ডিসাইটিস, অপারেশন করাতে হবে এখনই। সাধারণ মানুষের কাছে এ-এক দুঃস্বপ্ন। সত্যিই কি ঘাবড়ে যাবার মতো কিছু আছে? লিখছেন **ডা. বিজন কুমার টুডু ও ডা. বিতান কুমার দত্ত।**

সাধারণ মানুষ প্রায়শই বলে থাকেন আমাদের 'অ্যাপেন্ডিক্স' হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় ঠিকঠাক বলতে গেলে বলা উচিত 'অ্যাপেন্ডিসাইটিস' অর্থাৎ 'অ্যাপেনডিক্স-এর প্রদাহ' হয়েছে। অ্যাপেন্ডিক্স প্রকৃতপক্ষে মানবদেহের একটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ, যার দৈর্ঘ্য ৭.৫-১০ সেমি এবং অবস্থান ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে। যুবক-যুবতীদের আকস্মিক প্রচণ্ড পেটব্যাথার অন্যতম প্রধান কারণ এই অ্যাপেন্ডিসাইটিস। চিকিৎসাক্ষেত্রে জরুরী অস্ত্রোপচার প্রয়োজনীয় এমন রোগগুলির মধ্যেও অ্যাপেন্ডিসাইটিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই জেনে নেওয়া যাক এই 'অ্যাপেন্ডিসাইটিস' এর কিছু ইতিবৃত্তান্ত।

অ্যাপেনডিক্সে প্রদাহের কারণ

হঠাৎ করে হওয়া অ্যাপেনডিক্সের প্রদাহের কোন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কারণ বা তত্ত্ব এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবুও দেখা গেছে, কালো চামড়ার তুলনায় সাদা চামড়ার মানুষদের মধ্যে, এমনকি মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যেই এর প্রাদুর্ভাব বেশি (৩ জন পুরুষ এ রোগে আক্রান্ত হলে মহিলারা হবেন ২ জন)। মনে করা হয়, খাদ্যাভাসের পাশ্চাত্যকরণও এর জন্য দায়ী। পাশ্চাত্যের খাদ্যে পরিশ্রুত শর্করা ও মাংসের পরিমাণ অনেক বেশী। অন্য দিকে, সেলুলোজ জাতীয় তন্তুময় (ফাইবার) খাদ্য অ্যাপেন্ডিসাইটিস থেকে সুরক্ষা প্রদান করে বলে মনে করা হয়। অ্যাপেন্ডিক্সের নালী যদি কোন কিছু (যেমন— শক্ত মল, কৃমি, পরজীবীর ডিম, এন্টেমিবার সিস্ট বা নালীর কোন অংশের হঠাৎ সরু হয়ে যাওয়া) দ্বারা অবরুদ্ধ হয় তবে তাকে 'অবস্ট্রাক্টিভ অ্যাপেন্ডিসাইটিস' বলা হয়। আবার, 'নন-অবস্ট্রাক্টিভ অ্যাপেন্ডিসাইটিস'-এর জন্য এশ্চেরিসিয়া কোলাই, এন্টেরোকক্কাই, প্রোটিয়াস, সিউডোমোনাস, ক্লেবসিয়েলা তথা অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকেই দায়ী বলে মনে করা হয়— যেখানে অ্যাপেন্ডিক্সের সর্বব্যাপী প্রদাহ হয়ে থাকে।

কিভাবে হয় অ্যাপেন্ডিসাইটিস?

অ্যাপেন্ডিসাইটিস দু'প্রকারের হয়ে থাকে:

১. নন-অবস্ট্রাক্টিভ : এক্ষেত্রে ক্রমশ ধীরগতিতে প্রদাহ ঘটতে থাকে এবং আপনা থেকেই সাধারণত ঠিক হয়ে যায়। শারীরিক ক্ষতির পরিমাণ তুলনায় এক্ষেত্রে কম।

> আচমকা প্রচন্ড পেটব্যথা, বিশেষ করে পেটের ডানদিকে প্রবল ব্যথা, সেখানে একটু চাপ দিলেই যন্ত্রণায় ছটফট।

২. অবস্ট্রাক্টিভ : এই ধরনের অ্যাপেন্ডিসাইটিস ভীষণই ভীতিপ্রদ এবং অবহেলা করলে প্রাণসংশয় হতে পারে। অ্যাপেন্ডিক্সের নালী যদি কোন কারণে অবরুদ্ধ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে নালীর মধ্যেকার পদার্থগুলি জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয় এবং সংলগ্ন শ্লেষ্মাঝিল্লীর প্রদাহ ও লসিকাগ্রন্থিগুলির বৃদ্ধি ঘটায়। এর ফলে লসিকাবাহ ও পরে রক্তনালীর মধ্য দিয়ে যথাক্রমে লসিকা ও রক্তের চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং অ্যাপেন্ডিক্সের পচন ঘটায়। এর ফলে অ্যাপেন্ডিক্স ফুটো হয়ে যায় এবং তার ভেতরকার সংক্রমিত পদার্থ পেটের মধ্যে চলে এসে পেরিটোনিয়ামের প্রদাহ ঘটায়। তারপর স্থানীয় একটি ফোঁড়ার সৃষ্টি হতে পারে, যাকে বলা হয় 'অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস'।

রোগ নির্ণয় কিভাবে করবেন?

রোগীর ইতিহাস:

১. সাধারণত ২০-৪০ বছর বয়সীদের মধ্যে এ রোগ বেশী দেখা যায়।

২. প্রাথমিকভাবে সারা পেট জুড়েই কমবেশী যন্ত্রণা অনুভূত হয় (তবে মূলত নাভির চারিদিকে ব্যথা বেশী হয়)। এই ব্যথা ক্রমশ তলপেটের ডানদিকে সঞ্চারিত হয়। হঠাৎ কাশলে বা হঠাৎ নড়াচড়া করলে এই যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়।

৩. এই সময় ক্ষুধামান্দ্য, বমি বমি ভাব এমনকি বমি পর্যন্ত হতে পারে।

৪. রোগীর কমমাত্রায় বা বেশিমাত্রায় জ্বর থাকতে পারে।

রোগলক্ষণ :

১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে তলপেটের ডানদিকে চাপ দিলে দেখা যায় রোগী ব্যথা পাচ্ছেন।

২. পচনধরা অ্যাপেন্ডিক্স থেকে সংক্রমিত পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে সারা পেট জুড়েই ব্যথা হতে পারে।

৪. অনেকসময় তলপেটের বামদিকে চাপ দিলেও তলপেটের ডানদিকে ব্যথা অনুভূত হয়।

৫. কিছু ক্ষেত্রে রোগী যন্ত্রণার দরুণ কোমরের কাছে পা ভাঁজ করে থাকেন, তারপর পা সোজা করতে গেলে রোগী খুব ব্যথা পান।

৬. মলদ্বারে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে গেলে মলদ্বারের ডান দেওয়ালে যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

পরীক্ষা নিরীক্ষা কী কী লাগে?

রোগের উপসর্গ ও রোগলক্ষণ থেকে রোগনির্ণয় করা গেলেও অস্ত্রোপচারের আগে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেওয়া ভাল।

১. সাধারণ এক্স-রে এই রোগ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দিতে না পারলেও একে অন্ত্রের ছিদ্র হওয়া (পারফোরেশন) থেকে আলাদা করতে পারে।

২. তলপেটের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এই রোগকে সঠিকভাবে নির্ণয়ে অনেকাংশেই সাহায্য করে।

৩. সিটি স্ক্যান পরীক্ষা অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমী দুনিয়ায় প্রথম পছন্দ হিসেবে গৃহীত হলেও আমাদের মতো দেশে তা অধিকাংশ রোগীর পরিবারের কাছে যথেষ্টই খরচসাপেক্ষ।

অন্য কোন কোন রোগ অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলে ভুল হতে পারে?

মানবদেহের অনেক রোগেরই কিছু কিছু রোগলক্ষণ বা উপসর্গ অ্যাপেন্ডিসাইটিসের সাথে

মিলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—

১. বাচ্চাদের অন্ত্রের বিভিন্ন রোগে (এন্টোরোকোলাইটিস, মেকেল'স ডাইভারটি-কুলাইটিস, ইত্যাদি) অ্যাপেন্ডিসাইটিসের মতো আকস্মিক প্রচন্ড পেটব্যথা হয়।

২. কমবয়সী যুবক-যুবতীদের ক্ষেত্রে এই রোগকে ডানদিকের বৃক্ক (কিডনি)-এর ও গবিনী (ইউরেটার)-র জীবাণু-সংক্রমণ বা পাথুরি-জনিত যন্ত্রণা, অ্যামিবার সংক্রমণজনিত ব্যথা, ইত্যাদি থেকে আলাদা করা প্রয়োজন। পুরুষদের ডানদিকের শুক্রাশয় যদি অন্ডকোষে না নেমে পেটের মধ্যে বা কুঁচকিতে থাকে, তাহলে তার রক্তনালী হঠাৎ করে মুচড়ে গেলেও অ্যাপেন্ডিসাইটিসের মত ব্যথা হতে পারে।

৩. মাঝবয়সীদের ক্ষেত্রে, হঠাৎ করে হওয়া অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ, পিত্তনালীর প্রদাহ, ডিওডেনাম-এর ঘা (ডিওডিনাল আলসার) অ্যাপেন্ডি-সাইটিসের মতো উপসর্গ নিয়ে দেখা দিতে পারে।

৪. মহিলাদের ক্ষেত্রে, অস্বাভাবিক স্থানে (ডিম্ববাহী নালীতে) সঞ্চারিত গর্ভ (ectopic pregnancy) ফেটে যাওয়া, শ্রোণিচক্রের (তলপেটের) প্রদাহজনিত রোগ, এন্ডোমেট্রিয়োসিস বা ডিম্বাশয়ের কোনো সিস্ট (cyst) ফেটে যাওয়ার মতো ঘটনাও একই উপসর্গের সৃষ্টি করতে পারে।

৫. আন্ত্রিক অবরোধ বা বৃহদন্ত্রের ক্যান্সার বয়স্কদের ক্ষেত্রে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের মতো উপসর্গ সৃষ্টি করে।

চিকিৎসা:

অ্যাপেন্ডিসাইটিস-জনিত মৃত্যু বা শারীরিক অক্ষমতার সম্ভাবনাকে কমাতে শল্যচিকিৎসার ভূমিকা বেশী। তবে শল্যচিকিৎসার আগে কোন অনুভবযোগ্য মাংসপিন্ড (mass) আছে কিনা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এমন পাওয়া গেলে বুঝতে হবে যে অ্যাপেন্ডিক্সের প্রদাহকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ওমেন্টাম পর্দা অ্যাপেন্ডিক্সকে ঘিরে ফেলেছে, এমনটা হলে তখনই অস্ত্রোপচার করা ঝুঁকির হয়ে যাবে।

১. ব্যথার ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জরুরী অস্ত্রোপচার করাই ভালো।

২. পেট টিপে পরীক্ষা করার সময় ডাক্তারবাবু অ্যাপেন্ডিক্সের জায়গায় যদি কোনো পিন্ডের মতো অনুভব করতে পারেন তবে অস্ত্রোপচার তখন না করাই উচিত।

৩. অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস এবং পেরিটোনাইটিস হলে অনেক সময় প্রথমে পেট কেটে জমা পূঁজ বের করে দিয়ে পরবর্তীকালে অ্যাপন্ডিক্সের অস্ত্রোপচার করা হয়। একইসাথে অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা সংক্রমণের চিকিৎসা করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, অ্যাপেন্ডিক্স হলো আমাদের দেহের একটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ, যার নালীর মুখ আটকে গিয়েই অধিকাংশ অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়ে থাকে। এ রোগ বিভিন্ন উপসর্গ ও রোগলক্ষণ দিয়েই নির্ণয় করা যায়। যথাসময়ে সঠিক রোগ নির্ণয় হলে এবং শল্যচিকিৎসায় কোন বাধা না থাকলে জরুরী ভিত্তিতে অ্যাপেন্ডিক্স কেটে বাদ দেওয়াই অ্যাপেন্ডিসাইটিস সারানোর শ্রেষ্ঠ উপায়।

রোগীকে পরীক্ষা করেই চিকিৎসক অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগনির্ণয় করেন, তবে কিছু পরীক্ষা করতে পারলে ভাল হয়।

প্রথম অবস্থাতে জরুরী অস্ত্রোপচার করানোই সবচেয়ে ভাল। নইলে সমস্যা বেশী, চিকিৎসার জটিলতাও বেশী।

লেখক পরিচিতি: ডা. বিজন কুমার টুডু, এম বি বি এস ও ডা. বিতান কুমার দত্ত, এম বি বি এস। ডাক্তারি পাশ করে মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে কাজ করছেন।

কুইজ

এবারের কুইজটি তৈরি করেছেন **অভিষেক দাস।** বর্তমানে পুনেতে এম.বি.বি.এস পাঠরত

১. অণুবীক্ষণ যন্ত্র কে আবিষ্কার করেছিলেন?

২. কোন খনিজ মৌলের অভাবে গলগন্ড রোগ হয়?

৩. ঘুম না হওয়া ও অস্বাভাবিক বেশি ঘুম হওয়াকে ডাক্তারি পরিভাষায় কি বলে?

৪. নিউরোসিস্টিসারকোসিস রোগটির কারণ কি?

৫. ডিপিটি টিকাটির দ্বারা শিশুদের কোন কোন রোগ প্রতিরোধ করা যায়?

৬. যক্ষারোগ প্রতিরোধ করতে শিশুদের বিসিজি টিকা দেওয়া হয়। বিসিজি-র পুরো কথা কী?

৭. থাইরয়েডের অসুখে বাঁধাকপি খেতে বারণ করা হয় কেন?

৮. অতি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড কোনটি? কোন খাবারে থাকে?

৯. রক্তে কোন লিপিড জাতীয় পদার্থের মাত্রা বেশি থাকা হার্টের জন্য উপকারী?

১০. রাতকানা রোগ কী কারণে হয় ও কীভাবে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়?

১১. বিশ্ব এইডস দিবস কবে পালিত হয়?

১২. খুব বেশি খিদে পাওয়া, জলতেষ্টা পাওয়া, বার বার প্রস্রাব হওয়া, ওজন কমে যাওয়া, দুর্বল লাগা— এগুলি কোন রোগের লক্ষণ?

উত্তর ৫৬ পাতায়

চেনা ওষুধ অচেনা কথা

আইন বলে পাশকরা ডাক্তার ছাড়া কেউ ওষুধ লিখতে পারবেন না। কিন্তু তাহলে হবে কিভাবে? দেশে যত ডাক্তার চাই, তত নেই, যাও বা আছেন বেশির ভাগটাই শহরে। কিছু ওষুধ অবশ্য আইনতই ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া খাওয়া যেতে পারে বিশেষ পরিস্থিতিতে। এমনই একটা ওষুধ নিয়ে লিখেছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ।**

আমার বোনের কথাই বলি—বোন-ভগ্নীপতি দু'বছরের বাচ্চাকে নিয়ে গেছে পূর্ব সিকিমের জুলুকে। জুলুক জায়গাটা পর্যটকদের জন্য খোলা হয়েছে মাত্র ২০০৯-এ, আগে কেবল সৈন্যবাহিনীর ডেরা আর ছোট্ট একটা গ্রাম ছিল। জুলুকে গিয়ে ভাগ্নের সর্দি-জ্বর। সেনা হাসপাতালে ডাক্তার আছেন বটে, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় তাঁরা সিভিলিয়ানদের দেখেন না। ডাক্তার দেখাতে সিভিলিয়ানদের নামতে হয় প্রায় কুড়ি কিলোমিটার নীচের এক শহরে। ভাগ্যিস একটা ওষুধের দোকান ছিল আর ছিল মোবাইল। ফোনে আমার কাছে ওষুধের নাম জেনে দোকান থেকে ওষুধ কিনে খাওয়াতে ভাগ্নের জ্বর নামল। ওষুধটার নাম প্যারাসিটামল।

প্যারাসিটামলকে আমরা জ্বরের ওষুধ বলেই জানি, আসলে কিন্তু তা ব্যথারও বেশ ভালো ওষুধ, যে ব্যথার সঙ্গে ফোলা, গরমভাব ও লালভাব অর্থাৎ প্রদাহ নেই।

প্যারাসিটামলের রাসায়নিক নাম : এসিটামিনোফেন।

কী রূপে পাওয়া যায়?

প্যারাসিটামল পাওয়া যায় মুখে খাওয়ানোর তরলরূপে, প্রতি ৫ মিলিলিটারে থাকে ১২৫ মিলিগ্রাম ওষুধ। মুখে খাওয়ানোর বড়ি সাধারণত ১০০-৫০০ মিলিগ্রামের। এছাড়া ১০০ মিলিগ্রামের মলদ্বারে দেওয়ার সাপোজিটারী রূপেও পাওয়া যায়।

ছোটোদের জন্য আমি ব্যবহার করি ১২৫ মিলিগ্রামের গুলে খাবার ট্যাবলেট (dispersible tablet)। এটা সহজেই জলে গুলে যায়, খরচও পড়ে তরলের চেয়ে কম। রোগীর বয়স ১০ কিলোগ্রামের বেশি হলে ৫০০ মিলিগ্রামের বড়ি ব্যবহার করা চলে প্রয়োজনে টুকরো করে। ৪টে ১২৫ মিলিগ্রামের বড়ির জায়গায় ১টা ৫০০ মিলিগ্রামের বড়ি টুকরো করে দিলে খরচ অনেকটাই কমে।

ব্যবহার: মাসিকের সময়কার ব্যথা ও মাথাব্যথাসহ অল্প থেকে মাঝারি ব্যথায়, অস্টিওআর্থ্রাইটিস ও শরীরের নরম অংশের রোগ-জনিত ব্যথা কমানোয়, টীকা লাগানোর পর

যে জ্বর হয় তা-সহ সব ধরণের জ্বরে, হঠাৎ করে হওয়ার আধকপালী মাথাব্যথায়।

কখন খাবেন: এই ওষুধটা যদিও সাধারণভাবে খাবার পরে বা ভরা পেটে খেতে বলা হয়, তবে ব্যথা কমাবার প্রচলিত ওষুধগুলোর মধ্যে এটাই একমাত্র যা খালিপেটে খাওয়া চলতে পারে। অন্য ব্যথা কমাবার ওষুধ খেতে খেতে যদি পেটব্যথা হয় তবে ডাক্তারবাবুরা সাধারণত প্যারাসিটামলের শরণ নেন।

সাবধান থাকুন:

১. লিভারের রোগে মাত্রা বেশি হলে বিষক্রিয়া হতে পারে।
২. কিডনির রোগে।
৩. মদের নেশা করেন যাঁরা তাঁদের অল্প মাত্রায় দিতে হয়।
৪. প্যারাসিটামল অল্প মাত্রায় বুকের দুধের সঙ্গে বেরোয়। যেসব মা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তাঁরা স্বাভাবিক মাত্রায় অল্পদিন প্যারাসিটামল খেলে অসুবিধা নেই, তবে বাচ্চার দিকে নজর রাখতে হবে।

মাত্রা:

- টীকা লাগানোর পর জ্বর হলে ২-৩ মাস বয়সী বাচ্চাকে ৬০ মিলিগ্রাম প্যারাসিটামল মুখে খাওয়াতে হবে। প্রয়োজনে ৪-৬ ঘণ্টা বাদে আবার দেওয়া যাবে। তাতে জ্বর না কমলে অবশ্য ডাক্তারী পরামর্শ নিতে হবে।
- অল্প থেকে মাঝারি ব্যথা ও জ্বরে মুখে:

১. প্রাপ্তবয়স্কদের ৫০০ মিলিগ্রাম থেকে ১০০০ মিলিগ্রাম দেওয়া যাবে প্রয়োজনে ৪-৬ ঘণ্টা ছাড়া। তবে দিনে ৪ গ্রামের বেশি কখনওই নয়।

২. ৬-১২ বছর বয়সী বাচ্চাদের একেকবারে ২৫০ মিলিগ্রাম থেকে ৫০০ মিলিগ্রাম দেওয়া যাবে প্রয়োজনে ৪-৬ ঘণ্টা ছাড়া। দিনে ৪ বারের বেশি নয়।

৩. ১-৫ বছর বয়সী বাচ্চাদের একেকবারে ১২০ মিলিগ্রাম থেকে ২৫০ মিলিগ্রম দেওয়া যাবে প্রয়োজনে ৪-৬ ঘণ্টা ছাড়া। দিনে ৪ বারের বেশি নয়।

৪. ৩ মাস-১ বছর বয়সী বাচ্চাদের একেকবারে ৬০ মিলিগ্রাম থেকে ১২৫ মিলিগ্রাম দেওয়া যাবে প্রয়োজনে ৪-৬ ঘণ্টা ছাড়া। দিনে ৪ বারের বেশি নয়।

৫. ৩ মাসের কম বয়সীদের কখনই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া প্যারাসিটামল দেওয়া উচিত নয়। একেক মাত্রায় শরীরের ওজনের প্রতি কিলোগ্রাম পিছু ১০ মিলিগ্রাম করে দিতে হয়, জন্ডিস থাকলে ৫ মিলিগ্রাম করে।

- অল্প থেকে মাঝারি ব্যথা ও জ্বরে মলদ্বারে: বয়স অনুপাতে মাত্রা মুখে খাওয়ানোর মতই। ৪-৬ ঘণ্টা ছাড়া সাপোজিটারী মলদ্বারে ঢোকানো যায়, তবে দিনে ৪ বারের বেশি নয়।

প্যারাসিটামল ব্যবহারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া:

প্রায় শোনা যায় না বললেই হয়। তবে কখনও চামড়ায় ফুস্কুড়ি বা রক্তের রোগ হতে পারে।

বেশী মাত্রায় খেলে: লিভারের কোষে মারাত্মক রকম ক্ষতি হতে পারে, কিডনির নালিকাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অন্য ওষুধের সঙ্গে ব্যবহার: প্রায় যেকোনো ওষুধের সঙ্গেই প্যারাসিটামল ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্যারাসিটামলের প্রতিযোগী: অনেকে, এমনকি অনেক ডাক্তাররা পর্যন্ত, ভাবেন এস্পিরিন বোধহয় প্যারাসিটামলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, ধারণাটা ভুল। জ্বর বা ব্যথা কমানোয় দুই-ই তুল্যমূল্য, কেবল প্যারাসিটামলের প্রদাহরোধী ক্ষমতা নেই। এস্পিরিনেই বরং অনেক অসুবিধা, পাকস্থলীতে ঘা হতে পারে, রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা কমে যায়, এলার্জি হওয়ার সম্ভাবনা এস্পিরিনে বেশি। ভাইরাল জ্বরে অজানা কারণে রে'স সিন্ড্রোম নামে এক জটিলতায় মস্তিষ্ক ও লিভারের ক্ষতি হয় ১৬ বছরের কম বয়সীদের কখনো-কখনো, আর এস্পিরিন রে'স সিন্ড্রোমের ঝুঁকি বাড়ায়।

কেবল প্যারাসিটামল খেলে জ্বর কমতে একটু সময় নেয়, আর জ্বর কম থাকে মোটামুটি ৬ ঘণ্টা। তাই ওষুধ কোম্পানীগুলো বিভিন্ন সময়ে প্যারাসিটামলের বিভিন্ন প্রতিযোগীকে বাজারে নিয়ে এসেছে। আগে ছিল এনালজিন, ম্যাজিকের মতো কাজ দেখানোর জন্য ডাক্তাররা ব্যবহার করতেন খুব। ওষুধটার ব্যবহারে অনেক সময় রক্তের দানাদার সাদা রক্তকোষ কমে গিয়ে মারাত্মক ধরনের প্রতিক্রিয়া হত। জনস্বাস্থ্যকর্মীদের অনেক চেঁচামিচির পর এনালজিন নিষিদ্ধ হয়েছে। তারপর এল নিমেসুলাইড, এ ওষুধে জ্বর কম থাকে প্রায় ১২ ঘণ্টা। রোগী খুশী, ডাক্তারের পসার বাড়ে। ওষুধের দোকানী খুশী— প্যারাসিটামলের একটা বড়ি বিক্রি করলে যত লাভ, তার চেয়ে অনেক গুণ লাভ একটা নিমেসুলাইড বড়ি বিক্রি করলে। ডাক্তারবাবুরা প্রায় সবাই ওষুধ কোম্পানীর প্রচারে ভুলে গেলেন ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ওষুধে বাজারজাত হওয়ার লাইসেন্সই পায়নি। পরে দেখা গেল এ ওষুধ ব্যবহারে লিভারের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, বিশেষত বাচ্চাদের। আমাদের দেশে এখন বাচ্চাদের জন্য নিমেসুলাইড সিরাপ নিষিদ্ধ। যদিও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত বাচ্চা-বড় সবার জন্যই।

এতো সব জানার পর নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন বাজারে প্যারাসিটামল ওষুধটা পাবো কি নামে? দুটো নাম আমাদের খুব চেনা— Calpol আর Crocin, এছাড়া আরো ক'টা নাম মনে রাখুন— Ifimol, Eupyric, Metacin, Malidens, Pyrigesic, Doloprane, Biocetamol, ইত্যাদি। যে ব্র্যান্ড কম দামে পাবেন সেটাই কিনুন, কাজে ফারাক হবে না।

লেখক পরিচিতি: ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এম বি বি এস, জেনেরাল ফিজিশিয়ান, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক কর্মী। বর্তমানে হাওড়ার উলুবেড়িয়া মহকুমায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত এক ক্লিনিকের দায়িত্বে আছেন।

With Best Wishes from

A
Well
Wisher

মেয়েদের বয়ঃসন্ধির কিছু কথা

দশ থেকে আঠারো— মোটামুটি এই কয়েকটি বছর জুড়ে মেয়েদের শরীর ও মন জুড়ে আসে পরিবর্তনের ঢেউ। এ নিয়ে মেয়েরা কৌতূহলী, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, আর মা-বাবাদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। এ দুশ্চিন্তা প্রায়ই অমূলক, কিন্তু কখনো-সখনো ডাক্তারের পরামর্শ দরকার— লিখেছেন **ডা. রথীন রায়।**

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন মৃণালিনী দেবীর বিয়ে হয় তখন কনের বয়স দশ আর বরের বয়স বাইশ। এখনকার দিন হলে বাল্যবিবাহের দায়ে হয়তো বরকর্তা-কনেকর্তাদের জেল হয়ে যেত। কিন্তু তখন ওইরকম বয়সে বিয়ে খুব চালু ছিল। এমনকি রবিঠাকুর তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন যে অবস্থায় তখন তাঁদের শিশু, বা বড়জোর বালিকা বলা যেতে পারে। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ এব্যাপারে মত বদলে ফেলেছিলেন। ১৯২৯ সালে এদেশে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' প্রবর্তনের সময় যখন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা তাঁকে প্রশ্ন করেন, তখন ৭৮ বছর পেরোনো রবীন্দ্রনাথ বিয়ের বয়স ছেলেদের কমপক্ষে ২২ বছর আর মেয়েদের ১৬ বছর করার পক্ষে অভিমত বেশ জোরালোভাবেই ব্যক্ত করেছিলেন। আমরা জানি, বর্তমানে এদেশে মেয়েদের বিয়ের নিম্নতম বয়স হল ১৮, আর ছেলেদের ২১।

কিন্তু আমরা হঠাৎ বিয়ের বয়স নিয়ে পড়লাম কেন? কারণটা এই যে বিগত মোটামুটি একশ' বছর ধরে সারা পৃথিবী জুড়ে মেয়েদের বিয়ের নিম্নতম বয়স বাড়ানো হয়েছে। আর সেটা করা হয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের তথা শারীরবিজ্ঞানের সঙ্গে সাজুয্য রেখেই। দশ থেকে আঠারো— মোটামুটি এই কয়েকটি বছর জুড়ে মেয়েদের শরীর ও মন জুড়ে আসে পরিবর্তনের ঢেউ। বিয়ে করার আগে মেয়েটির শরীর সন্তানধারণে সক্ষম হওয়া দরকার, নয়তো মায়ের বিপদের আশঙ্কা, এবং সন্তানেরও সমস্যা হবার সম্ভাবনা। এবং বিবাহ-পরবর্তী যৌনতা অপরিপক্ক অল্পবয়সী মেয়ের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে আসে। প্রসঙ্গত, ছেলেদের নিম্নতম বিয়ের বয়স স্থির করার সময় কিন্তু শারীরিক সক্ষমতার কথা ভাবা হয় নি, ভাবা হয়েছে তার মানসিক পরিপক্কতার কথা, এবং অতি অবশ্যই তার রোজগার করার সম্ভাব্য বয়সের কথা। এটা বর্তমান সামাজিক অবস্থানের কথা মাথায় রেখেই করা হয়েছে।

বয়ঃসন্ধি কি?

প্রকৃতিদেবী অদ্ভুত হিসেবী, তাঁর নিয়মে অপচয় নেই। এই যে মানুষ জন্মায়, বড় হয়, তাদের শরীর বাড়ে, মন পরিপক্ক হয়, এই শারীরিক-মানসিক পূর্ণতালাভ চলে হাত ধরাধরি করে। মেয়েদের শরীরে গর্ভধারণের ক্ষমতা কিন্তু অর্জিত ক্ষমতা। 'অর্জিত' এই অর্থেই যে মেয়েটি যখন শিশু তখন তার গর্ভধারণের শারীরিক ক্ষমতা থাকে না। সেই শারীরিক ক্ষমতা তার থাকলে বায়োলজিক্যাল একটা মুশকিল ছিল; শরীরের বৃদ্ধি একটা নির্দিষ্ট মানে না পৌঁছলে সন্তান ধারণের জন্য ন্যূনতম যতটুকু জায়গা দরকার একটি (শিশুর) নারীশরীরে ততটা জায়গাই থাকে না। তাই সেই শরীর যদি মা হবার জন্য প্রস্তুত থাকত তবে তাতে সমূহ অপচয় হত, কেননা ন্যূনতম জায়গা নেই যে শরীরে সেই শরীরকেও মা হবার জন্য প্রস্তুত করতে প্রচুর শারীরিক ব্যয় প্রয়োজন। প্রকৃতিদেবী বলছি বটে, আসলে কথাটা হল ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন। তা অপচয় সহ্য করে না। তাই শিশু মেয়েটির মধ্যে সন্তান ধারণের ক্ষমতা থাকলে চলবে না, আবার তার মধ্যে ভবিষ্যতে সন্তান ধারণের ক্ষমতা না থাকলেও নয়। এ এক টানাপোড়েন। এবং এই টানাপোড়েনের সবচেয়ে সুন্দর সমাধান হল— একটা বয়সের পরে যখন মেয়েটির শারীরিক কাঠামোর বিকাশ অনেকটা সম্পূর্ণ তখন তার আসে বয়ঃসন্ধি— আমরা আগেই যাকে বলেছি মেয়েদের শরীর ও মন জুড়ে আসা পরিবর্তনের ঢেউ।

একটু টেকনিক্যাল ভাষায় বলতে গেলে, বয়ঃসন্ধি বলতে আমরা জীবনের এমন একটা সময়ের কথা বলি যখন মেয়েদের শরীরে গৌণ যৌন লক্ষণ তথা Secondary Sexual Character-গুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে থাকে এবং এই বিকাশের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তারা সন্তানধারনে সক্ষম হয়ে ওঠে। কোন মেয়েটির ঠিক কবে বয়ঃসন্ধি হবে বা কতদিন ধরে সে পর্যায়টি চলবে তা কিন্তু সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট নয়— তা অনেকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো জীনগত বৈশিষ্ট্য যা বংশধারায় প্রবাহিত হয়। দেখা গেছে মা এবং তাঁর কন্যা সন্তানদের মধ্যে প্রথম ঋতুমতী হওয়ার সময়ের একটা সম্পর্ক আছে। প্রথম ঋতুমতী হওয়া বা ভাল বাংলায় বলতে গেলে রজোদর্শন, হল বয়ঃসন্ধির সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট মাইলফলক। এছাড়া বয়ঃসন্ধি শুরুর সময় ও তা কতদিন ধরে চলবে সেটা নির্ভর করে মেয়েটির শারীরিক গঠন, শরীরের পুষ্টির অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান,

আবহাওয়া ইত্যাদির ওপরে। যেমন যাদের ওজন স্বাভাবিকের থেকে প্রায় ৩০শতাংশ পর্যন্ত বেশি তারা তুলনায় কম বয়সে ঋতুমতী হয়, আবার যারা গভীর অপুষ্টির শিকার তাদের ঋতুমতী হতে দেরী হয়। ভৌগোলিকভাবে বিষুবরেখার কাছাকাছি থাকলে, সমতল অঞ্চলে বাস করলে, এমনকি শহরবাসী হলে, মেয়েদের বয়ঃসন্ধি স্বাভাবিকভাবেই বিষুবরেখা থেকে দূরে বা পাহাড়ী এলাকায় এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের থেকে আগে শুরু হয়। এ ব্যাপারে দুটি চিন্তা-আকর্ষক কাহিনীতে আমরা যথাসময়ে আসব।

বয়ঃসন্ধির শারীরিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধির এই পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে ঘটে। যদি এই নির্দিষ্ট ক্রমের কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় অথবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বয়ঃসন্ধির প্রক্রিয়াগুলি শেষ না হয় তাহলে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে বলে সন্দেহ করা হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি সাধারণত মোটামুটি সাড়ে চার বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়। একদম শুরুতেই হয় শারীরিক বৃদ্ধি (পরিভাষায় বলা হয় Growth spurt), তারপর পর্যায়ক্রমে স্তনের পরিবর্তন (পরিভাষায় Thalarche), যৌনরোমের (Pubic hair) আর্বিভাব এবং সবশেষে হয় ঋতুর আর্বিভাব। এই ঋতুর আবির্ভাব তথা Menarche বয়ঃসন্ধির প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টি-আকর্ষক ব্যাপার এবং তার ফলে বাবা-মায়েরা সবচেয়ে সহজে এ ব্যাপারে ঠিক তারিখ ইত্যাদি বলতে পারেন।

সাধারণভাবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধি আগে শুরু হয়ে আগেই শেষ হয়। শারীরিক বৃদ্ধির বেশিরভাগটাই সম্পন্ন হয় ঋতুমতী হবার আগে, যদিও ঋতু শুরুর পরে খুব অল্প বৃদ্ধি হয়ে থাকে। স্তনের গঠন সম্পন্ন হতে সাধারণভাবে ৩ থেকে ৩.৫ বছর সময় লাগে, তবে কারও কারও ২বছরের মধ্যেও এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। চার থেকে পাঁচটি ধাপে স্তনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার শুধুমাত্র স্তনের পরিমাপ দিয়ে শারীরিক বিকাশের পরিপূর্ণতা বা সামগ্রিক maturity পরিমাপ করা হয় না। যৌনরোমের ক্ষেত্রেও চার থেকে পাঁচটি ধাপের মধ্য দিয়ে পরিপক্কতা লাভ হয়।

বয়ঃসন্ধির পরিবর্তনের নেপথ্য কুশীলব

মেয়েদের এই শারীরিক বিকাশ ঘটানোর জন্য শরীরে বিভিন্ন হরমোনের কার্যকলাপ জরুরী এবং একই রকমের জরুরী হল এই হরমোনগুলির নিজেদের মধ্যেকার সমন্বয়। যেসব বিশেষ হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধির বিকাশ হয় তাদের সম্পর্কে বলার আগে হরমোন জিনিসটা কি সে ব্যাপারে দু-চার কথা বলে নেওয়া দরকার, কেননা এই যে সাধারণ মানুষেরা এক-একজন 'হরমোন' শব্দটার একেক রকমের অর্থ করেন। হরমোন হল শরীরের কিছু গ্রন্থি নিঃসৃত জৈব-রাসায়নিক পদার্থ যারা সরাসরি রক্তে গিয়ে মেশে এবং উৎস থেকে অনেক দূরে গিয়ে কাজ করতে পারে। যেহেতু হরমোন-গ্রন্থিগুলির ক্ষরিত পদার্থ সরাসরি রক্তে গিয়ে মেশে তাই এইসব গ্রন্থির রসক্ষরণের জন্য নিজস্ব নালী নেই, যেটা শরীরের অন্য সব গ্রন্থিতে থাকে। তাই হরমোন-গ্রন্থিদের 'অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি' বা 'অনাল-গ্রন্থি'-ও বলা হয়। এক-একটা হরমোনের এক-একটা কাজ। যেমন— আমাদের খুব পরিচিত রোগ ডায়াবেটিস হয় ইনসুলিন নামক হরমোনের অভাবে। ইনসুলিন-এর ঘাটতি থাকলে শরীর দেহের মধ্যেকার শর্করা বা চিনিকে কাজে লাগাতে পারে না।

মেয়েদের বয়ঃসন্ধির সময়ে শরীরে যেসব পরিবর্তন আসে তার সবগুলোর পেছনেই কয়েকটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি তথা হরমোন-গ্রন্থির ভূমিকা রয়েছে। আমরা এককথায় বলি Hypothalamus-Pituitary-Ovarian Axis, বা আরও সংক্ষেপে H-P-O Axis। অর্থাৎ একদিকে রয়েছে মস্তিষ্কের ঠিক নীচে অবস্থিত হাইপোথ্যালামাস গ্রন্থি, তারপর তার নীচে পিট্যুইটারি গ্রন্থি এবং তারপর তলপেটের ডিম্বাশয়, যা ডিম্ব-উৎপাদন ছাড়াও যৌন-হরমোন উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা এক একটি গ্রন্থি অন্য গ্রন্থির সঙ্গে মিলে কাজ করে, ফলে একটি গ্রন্থির কাজকর্মের প্রভাব অন্য দুটি গ্রন্থির ওপরেও পড়ে। আর তাই আমাদের অনেক সময়ে এগুলির প্রতিটিকে আলাদা আলাদা করে না দেখে একসাথে একটি 'কার্যকরী একক' (Functional Unit) হিসেবে বিচার করতে হয়। তখন এই H-P-O Axis নামটা আমাদের কাজে আসে।

এইসব হরমোন-গ্রন্থির কাজকর্মের টেকনিক্যাল বিষয়গুলি অনর্থক জটিলতা বাড়াবে তাই শুধু এটুকুই বলে রাখা ভাল যে এরই সঙ্গে অ্যাড্রেনাল নামক আরেকটি গ্রন্থিও বয়ঃসন্ধির সময়ে তার কাজ বাড়িয়ে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এবং যেটা জানার জন্য জরুরী বিষয় তা হল যে যদি কোনও কারণে H-P-O Axis বা অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয় তবে বয়ঃসন্ধির প্রত্যাশিত পরিবর্তনগুলি ঠিকঠাক ঘটবে না, এবং সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রোগ হিসেবে দেখা দিতে পারে।

কখন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত?

অনেক সময় নির্দিষ্ট সময়ে মাসিক শুরু হয়েও প্রথম এক দুই বছর কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। যেমন অত্যধিক রক্তস্রাব বা প্রত্যেক মাসে মাসিক না হয়ে অনিয়মিত ভাবে হওয়া। যদি অন্য কোনও জটিলতা না থাকে তবে দু-এক বছরের মধ্যে H-P-O Axis পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং স্বাভাবিক ঋতুক্রম শুরু হয়। সুতরাং এটুকু সময়ের জন্য সামান্য অনিয়মিত মাসিকের জন্য অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না, খুব সম্ভব সেটা আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

তবে যেসব অবস্থায় চিকিৎসকের কাছে

যেতেই হবে সেগুলি হল:

- ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত কোনো বয়ঃসন্ধির পরিবর্তন দেখা গেল না
- ১৬ বছর বয়সেও ঋতুমতী হল না অথবা বয়ঃসন্ধির পরিবর্তন দেখা দেওয়ার ৫ বছরের মধ্যে ঋতুমতী হল না
- ৮ বছর বয়সের আগে ঋতুমতী হল (precocious puberty)
- বয়ঃসন্ধির পরিবর্তন মেয়েদের মতো না হয়ে ছেলেদের মতো হল (heterosexual puberty)

সঠিক সময়ে ঋতুমতী না হওয়া, বা খুব কম বয়সে ঋতুমতী হওয়া কিন্তু এইসব হরমোন গ্রন্থির রোগ থেকে হতে পারে। যেমন ঋতু আরম্ভে দেরি পিট্যুইটারি গ্রন্থির কারণে হতে পারে— এই গ্রন্থির সার্বিক অকার্যকারিতায় (panhypopituitarism) ঋতু আরম্ভে দেরি হয় এবং তার সাথে বামনত্ব ও অন্য কয়েকটি হরমোন গ্রন্থির অকার্যকারিতাজনিত রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। আবার কিছু জীন-ঘটিত সমস্যায় বা বলা ভাল ক্রোমোসোমের ত্রুটিতে ঋতু আরম্ভে দেরি হয়— যেমন XO ক্রোমোসোম প্যাটার্ন থাকলে। আবার উল্টোদিকে ৮ বছর বয়সের আগে ঋতুমতী হওয়া, যাকে আমরা বলি অকাল-বয়ঃসন্ধি (precocious puberty), সেটা অনেক সময় হাইপোথ্যালামাস গ্রন্থির টিউমার বা সংক্রমণের সম্ভাবনা সূচিত করে। সুতরাং অতিরিক্ত আগে ঋতু শুরু হওয়া বা যথাসময়ে ঋতু শুরু না হওয়া— এর যেকোনও একটি হলেই ডাক্তার দেখানো দরকার।

শেষ কথা

বয়ঃসন্ধি কখন হয়— এই নিয়ে আলোচনা করার সময়ে আমরা বলেছিলাম, এ ব্যাপারে দুটি চিন্তা-আকর্ষক ব্যাপারের কথা আমরা যথাসময়ে বলব। তার মধ্যে প্রথমটি হল এই যে ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গত একশ পঁচাত্তর বছর ধরে বয়ঃসন্ধির বয়স ক্রমে কমে আসছে— প্রতি দশকে ১ মাস থেকে ৩ মাস করে বয়ঃসন্ধির বয়স এগিয়ে আসছে। তাই আজ থেকে একশ বছর আগে সেখানে মেয়েদের যে বয়সে বয়ঃসন্ধি হত এখন তার চেয়ে প্রায় কুড়ি মাস আগে বয়ঃসন্ধি হচ্ছে। অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি কখন হবে এটা সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর ও মেয়েটির শারীরিক পুষ্টির ওপর নির্ভর করে, হয়তো বা নির্ভর করে তার মানসিক পরিপক্কতার ওপরেও। এবং তার সঙ্গে তার বংশগতি তথা জেনেটিক মেক-আপের ব্যাপারটিও আছে।

ভাবতে অবাক লাগে যে আজ থেকে প্রায় একশ পঁচাত্তর বছর আগেই প্রায় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মত ঠিক এই সত্যটারই একেবারে কত কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন একজন বাঙ্গালি চিকিৎসক— এবং সেটাই আমাদের দ্বিতীয় চিন্তা-আকর্ষক ব্যাপার, চিত্ত-আকর্ষক ব্যাপারও বটে। সেই বাঙ্গালি চিকিৎসক পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের মূল খ্যাতি এইখানে যে তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনে এদেশে বসে প্রবল সামাজিক বিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শব-ব্যবচ্ছেদ করেন। অর্থাৎ তিনিই প্রথম ভারতীয় মড়া-কাটা ডাক্তার, অবশ্য আয়ুর্বেদ-চর্চার প্রয়োজনে এদেশে এক যুগে শব-ব্যবচ্ছেদের চল ছিল, পরে তা বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকে। এবং সামাজিকভাবে তা অতি গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য হতে থাকে।

কিন্তু মধুসূদন গুপ্তের যে কাজটা তুলনায় একেবারেই অবহেলিত রয়ে গেছে তা হল এই যে তিনিই প্রথম সেই ১৮৪০ সাল নাগাদ এদেশের নারীদের রজোদর্শনের বা ঋতুমতী হবার বয়স নির্ধারণ করেন, এবং তিনি তা করেন রীতিমত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার ভিত্তিতে। তিনি সমীক্ষা করে জানান যে এদেশের নারীরা ১২ থেকে ১৩ বছর বয়সে প্রথম ঋতুমতী হন। আমরা আগেই দেখেছি এখন এটা প্রমাণিত সত্য যে ভৌগোলিকভাবে বিষুবরেখার কাছাকছি থাকলে (ভারতে) মেয়েদের বয়ঃসন্ধি স্বাভাবিকভাবেই বিষুবরেখা থেকে দূরে (ইংল্যান্ডে) বসবাসকারীদের থেকে আগে শুরু হয়। কিন্তু সে সময়ে এটা জানা ছিল না। আর সেটা ভারতে সাহেব ডাক্তারদের যুগ, তাঁরা দেখতেন যে এদেশে মেয়েদের ঋতুমতী হবার বা প্রথম গর্ভধারণ করার যে বয়স বলা হয়, সে বয়সে ইংল্যাণ্ডের মেয়েরা ঋতুমতী হয় না। তখন তাঁরা অনেক সময়ে ধরেই নিতেন যে এদেশে উচ্চকোটির মানুষও হয় এতই মূর্খ যে তাঁদের কেউই নিজের সঠিক বয়সটুকুও জানেন না অথবা তাঁরা এমন মিথ্যাবাদী যে ঠিক বয়স জানলেও সব সময়ে বয়স ভাঁড়ান। তাঁদের আসল বয়স নিশ্চয়ই বেশি, কেননা বিজ্ঞান যেহেতু সর্বজনীন সেহেতু ইংল্যান্ডে আর ভারতে মেয়েদের ঋতুমতী হবার বয়স আলাদা হতে পারে না। সত্যি কথা বলতে কি, মধুসূদন তাঁর গবেষণাকার্যটি করেন ইংল্যাণ্ডের কোনও এক মি. রবার্টসন-এর অনুরোধে, যিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর সর্বত্র মেয়েদের রজস্রাব শুরু হবার বয়স এক।

বৈদ্যসন্তান মধুসূদন পিতৃপুরুষের আয়ুর্বেদ ছেড়ে এদেশে প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন, কেননা চিকিৎসাবিজ্ঞান সর্বজনীন, তার পদ্ধতি যদি ইংল্যাণ্ডে ফলপ্রসূ হয়ে থাকে তবে তা ভারতেও সমান কার্যকর। কিন্তু মধুসূদন কোনও একভাবে এটাও বুঝেছিলেন, বিজ্ঞান সর্বজনীন, কিন্তু তা নির্বিশেষ নয়, পুরোপুরি স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষও নয়। বয়ঃসন্ধি নিয়ে তাঁর গবেষণাতেও সেই গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষাত পাওয়া সম্ভব।

লেখক পরিচিতি: ডা. রথীন রায়, এম বি বি এস. ডি জি ও, এম ডি. বর্তমানে একটি সরকারী হাসপাতালে কর্মরত।

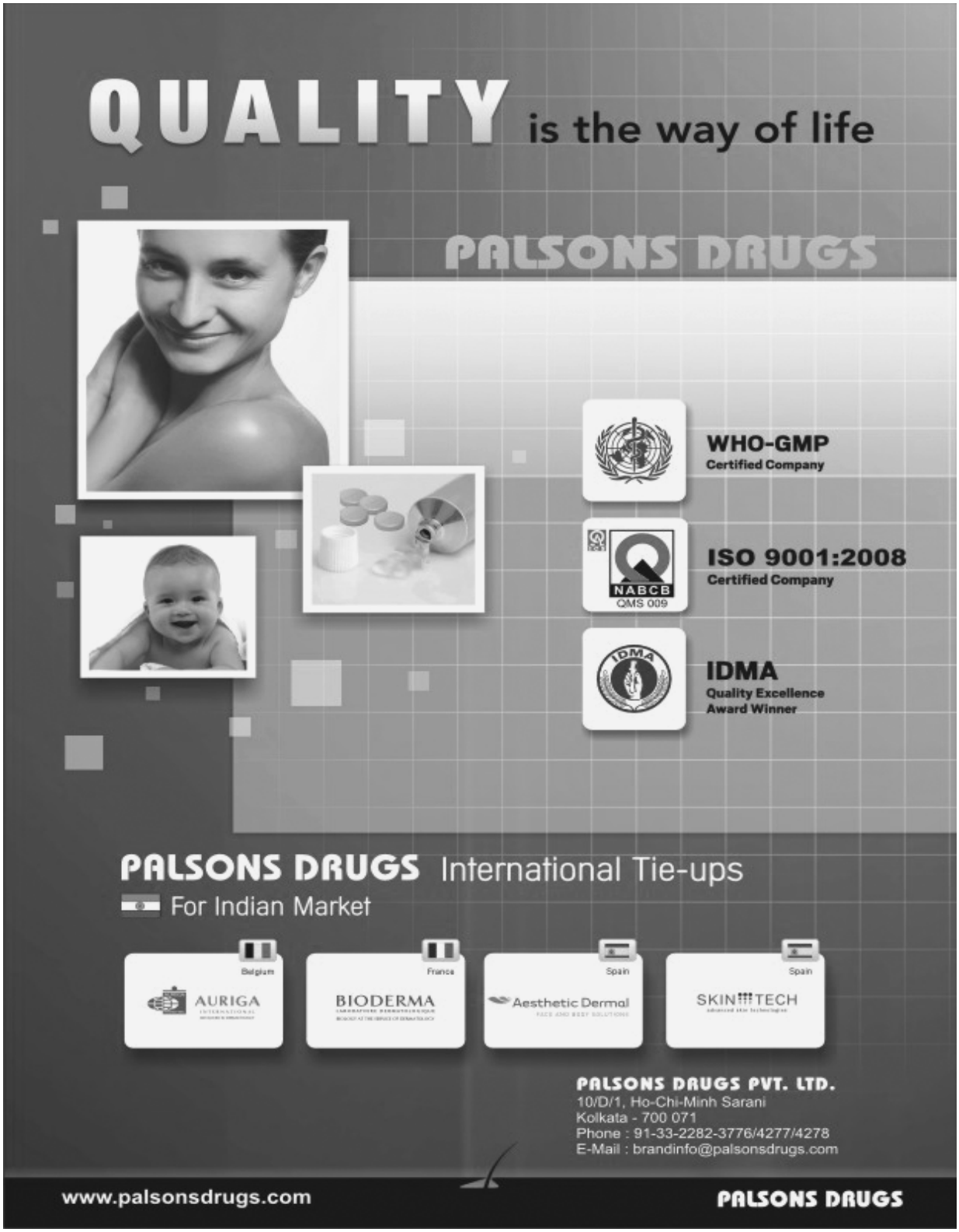
QUALITY is the way of life
PALSONS DRUGS
WHO-GMP
Certified Company
ISO 9001:2008
Certified Company
NABCB
QMS 009
IDMA
Quality Excellence
Award Winner
PALSONS DRUGS International Tie-ups
For Indian Market
Belgium
AURIGA
France
BIODERMA
Spain
Aesthetic Dermal
Spain
SKINTECH
PALSONS DRUGS PVT. LTD.
10/D/1, Ho-Chi-Minh Sarani
Kolkata - 700 071
Phone : 91-33-2282-3776/4277/4278
E-Mail : brandinfo@palsonsdrugs.com
www.palsonsdrugs.com
PALSONS DRUGS

মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া— প্রতিকার কি সম্ভব?

থ্যালাসেমিয়া রোগটি নিয়ে বিস্তর প্রচার সত্ত্বেও বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী দুজনে থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক কিনা সে পরীক্ষা সবাই করান না। বিয়ের পর যদি জানা যায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিজেরা সুস্থ কিন্তু থ্যালাসেমিয়ার বাহক, তখন সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগ হবার সম্ভাবনা শতকরা ২৫ ভাগ। এমন অবস্থায় অনেক দম্পতি পড়েন মহা সঙ্কটে। এর প্রতিকার সম্ভব— লিখছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জী।**

থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত সমস্যা। এই রোগে মানুষের রক্তের লোহিতকণিকা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে রোগীর অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা দেখা যায় এবং রক্তের অক্সিজেন বহন করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। সাধারণত শৈশবকালেই এই রোগ ধরা পড়ে। কয়েক বছরের মধ্যেই শিশুর প্লীহা (spleen) বড় হয়ে যায়, হাড় দুর্বল হয়ে যায় এবং শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়। শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিমাসে এক বা একাধিকবার রক্ত সঞ্চালন করতে হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ২০-৩০ বছর বয়সের মধ্যেই রোগী মারা যায়।

পৃথিবীতে যত থ্যালাসেমিয়ার রোগী আছেন তার মধ্যে ১০ শতাংশই বাস করেন ভারতবর্ষে। আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ১৫০০ শিশুর জন্ম হয় থ্যালাসেমিয়া-জাতীয় সমস্যা নিয়ে। ভারতীয়দের মধ্যে প্রতি ৩০ জনের মধ্যে একজন থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক। আর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যখন এই রোগের বাহক হন তখন সন্তানের থ্যালাসেমিয়া রোগ হবার সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। ইংরেজি ভাষায় বাহকদের বলা হয় carriers বা থ্যালাসেমিয়া মাইনর (Minor) আর রোগীদের বলা হয় থ্যালাসেমিয়া মেজর (Major)।

থ্যালাসেমিয়ার জিন

এবার দেখে নেওয়া যাক বাবা-মায়ের কাছ থেকে থ্যালাসেমিয়া রোগ সন্তানসন্ততির কাছে কিভাবে পৌঁছায়। মানুষের শরীরের অনেক বৈশিষ্ট্য যেমন— চোখের মণির রঙ, ইত্যাদির জন্য একজোড়া জিনের প্রয়োজন। এর একটি আসে বাবার কাছ থেকে আর একটি আসে মায়ের কাছ থেকে। বংশগত কিছু রোগের ক্ষেত্রেও একই সূত্র প্রযোজ্য। যাঁদের শরীরে এই জিনজোড়ার মধ্যে একটি ভালো জিন অন্যটি মন্দ জিন তাঁরা হলেন সেই রোগের বাহক। যাঁদের শরীরে রোগের জন্য দায়ী দু'টি মন্দ জিনই উপস্থিত থাকে তাঁরা হলেন সেই রোগের রোগী। অর্থাৎ বাবা-মা দুজনেই যদি থ্যালাসেমিয়ার বাহক (Thalassemia Minor) হন এবং তাঁদের মন্দ জিনটি সন্তানকে দেন তাহলে তাঁদের সন্তানের থ্যালসেমিয়া রোগটি (Thalassemia Major) হয়। এর সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। আর বাবা-মায়ের মধ্যে যদি একজন ভালো জিনটি দেন এবং আর একজন মন্দ জিনটি দেন তাহলে তাঁদের সন্তান হন থ্যালাসেমিয়ার বাহক। এর সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ। যদি দুজনেই ভালো জিনটি দেন তাহলে সন্তান সম্পূর্ণভাবে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত হন। এর সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, বাবা-মা কে কোন জিনটি দেবেন সেটি কিন্তু কারো নিয়ন্ত্রণে নেই। সম্ভবতঃ প্রকৃতির খেয়ালেই সে ঘটনা ঘটে।

বিয়ের আগে কি পরীক্ষা করবেন?

এখন প্রশ্ন আসতে পারে— কোনো মানুষ থ্যালাসেমিয়ার বাহক কিনা কিভাবে জানবেন। এর জন্য খুব সাধারণ একটি রক্তপরীক্ষার প্রয়োজন। এর নাম HPLC। এই টেস্টের জন্য প্রায় চার'শ টাকা খরচ হয়। বিয়ের আগে পাত্রপাত্রীর, না হলে অন্তত সন্তান চাইছেন এরকম সব দম্পতির এই টেস্ট করিয়ে নেওয়া ভালো। সাইপ্রাস দেশে আইন করে দু'জন থ্যালাসেমিয়া বাহকের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সে দেশ থেকে এই রোগ নির্মূল হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে এ-ধরনের কোনো আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়। কারণ এতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারে। তবে বিয়ের আগে হবু স্বামী-স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় এই পরীক্ষা করিয়ে নেন সেটা খুবই ভালো হয়। যদি পরীক্ষার ফল জেনেও কোনো পাত্র-পাত্রী ভাবেন যে তাঁরা বিয়ে করবেন, তাঁদের সে স্বাধীনতা তো রইলই। কিন্তু সেক্ষেত্রে

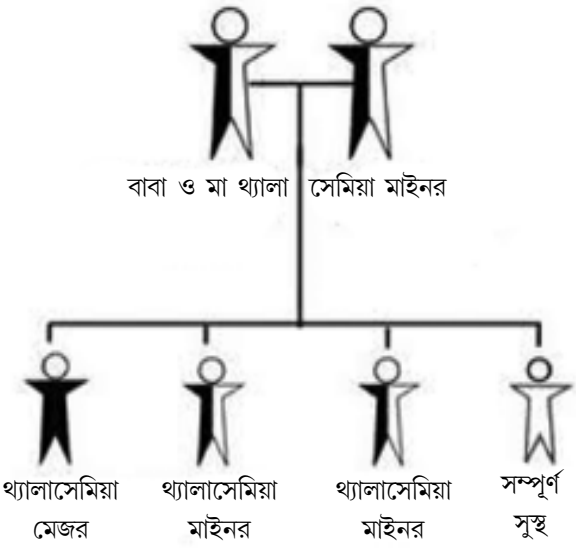

অন্তত বাচ্চা জন্মের আগে তাঁরা জানতে পারবেন বাচ্চার থ্যালাসেমিয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, এবং অন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে পারবেন। কী অন্য ব্যবস্থা সে কথাতে আসছি।

গর্ভাবস্থায় কী পরীক্ষা করাবেন?

ধরা যাক বিয়ের আগে বা পরে গর্ভাবস্থায় প্রথম দু'মাসের মধ্যে জানা গেছে বাবা-মা দু'জনেই থ্যালাসেমিয়ার বাহক। তাহলে কি করণীয়? প্রথম কথা, ঘাবড়াবেন না। এই পরিস্থিতিতেও বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া মেজর হবার সম্ভাবনা ২৫ শতাংশ। বাকি ৭৫ শতাংশ বাচ্চা কিন্তু সুস্থ হবে। এই সমস্ত বাবা-মায়ের রক্তের এরপর একটি করে জিন টেস্ট করতে হয়। তাতে বোঝা যায় ঠিক কি ধরনের জেনেটিক সমস্যা বা মিউটেশন-এর জন্য তাঁরা থ্যালাসেমিয়া বাহক হয়েছেন। বাবা-মায়ের রক্তে সঠিক মিউটেশন চিহ্নিত করার পর আসে ভ্রূণ পরীক্ষার পালা। ভ্রূণের মধ্যে ওই মিউটেশনের দুটোই থাকলে তবেই বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া মেজর হবে। যে কোনো একটি মিউটেশন থাকলে বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া মাইনর অর্থাৎ বাহক হবে। আর কোনো মিউটেশনই না থাকলে বাচ্চা সম্পূর্ণভাবে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত হবে।

ভ্রূণের ওপর পরীক্ষা—

এবার আসি ভ্রূণ-পরীক্ষা সংক্রান্ত কিছু কথায়। ভ্রূণ-পরীক্ষার জন্য মূলতঃ যে টেস্ট করা হয় তার নাম CVS (Chorionic Villus Sampling)। এর অর্থ বাচ্চার সাথে যে ফুলটি (placenta) থাকে তার সামান্য অংশ বের করে পরীক্ষা করা। গর্ভাবস্থার তিন মাস পর থেকে এই টেস্ট করা যায়। আলট্রাসোনোগ্রাফি মেশিনে দেখতে দেখতে মায়ের পেটের মধ্যে একটি বিশেষ ছুঁচ ঢুকিয়ে এই কাজ করা হয়। মাকে এজন্য অজ্ঞান করতে হয় না। তবে মায়ের পেটের সামান্য একটু অংশ অবশ করে নেওয়া হয় যাতে ব্যাথা না লাগে। CVS থেকে প্রাপ্ত নমুনা এবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় পরবর্তী পরীক্ষার জন্য। রেজাল্ট পেতে সময় লাগে সপ্তাহ দুয়েক। CVS সম্পর্কে একটি কথা অবশ্য জানা প্রয়োজন। শতকরা ৯৯ জনের কোনো সমস্যা হয় না তবে ১ শতাংশের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বাচ্চা সুস্থ কিনা জানতে হলে এইটুকু ঝুঁকি নিতেই হয়। আপনাকে ভাবতে হবে ঝুঁকি এখন নেওয়া ভালো না কি সারাজীবন একটি অসুস্থ সন্তানের দায়িত্ব নেওয়া ভালো।

নানা রকম টেস্টের জটিলতায় এতক্ষণে হয়তো ভাবতে শুরু করেছেন এর ব্যয়ভার সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে! বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে এই সমস্ত টেস্টের খরচ আনুমানিক ১৫-২০ হাজার টাকা। এত খরচ করার দরকার নেই। কলকাতা মেডিকেল কলেজ বা নীলরতন

সরকার মেডিকেল কলেজের হিমাটোলজি বিভাগে যেতে পারেন। এই দুই হাসপাতালের বাইরে পশ্চিমবঙ্গে আর কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়ার জন্য ভ্রূণ পরীক্ষা হয় কিনা আমার জানা নেই। সরকারী হাসপাতালের টেস্ট কম বিশ্বাসযোগ্য এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই।

পরীক্ষার ফল খারাপ এলে কী করবেন?

এখন ধরে নেওয়া যাক গর্ভাবস্থায় চারমাসের মাথায় একটি ভ্রূণের থ্যালাসেমিয়া মেজর ধরা পড়েছে। তাহলে কি করণীয়? এরকম পরিস্থিতিতে বেশির ভাগ মা-বাবাই ডাক্তারের দ্বারা গর্ভপাতের রাস্তা বেছে নেন। ভারতবর্ষে নিয়মানুযায়ী ২০ সপ্তাহ বা পাঁচ মাস পর্যন্ত বাচ্চা নষ্ট করানো যায়। সঠিক ভাবে প্রশিক্ষিত ডাক্তারের কাছে গর্ভপাত করালে মায়ের স্বাস্থ্যহানির বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। পরবর্তী কালে গর্ভধারণেও কোনো অসুবিধা হয় না। মনে রাখতে হবে বাবা-মা থ্যালাসেমিয়ার বাহক হলে মা যতবার গর্ভধারণ করবেন ততবারই ভ্রূণের পরীক্ষা করতে হবে।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা হয় না। রোগ উপশম-এর জন্য কিছু ব্যবস্থা নিয়ে রোগীকে সাময়িক সুস্থ রাখা যায় মাত্র। বারংবার রক্ত সঞ্চালনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াও অনেক। কয়েক বছর বাদেই প্লীহা বাদ দেবার জন্য অপারেশন করতে হয়। অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন এবং স্টেম সেল প্রতিস্থাপন-এর মতো আধুনিক চিকিৎসা ভীষণ ব্যয়বহুল। সব ক্ষেত্রে সফলও হয় না। এজন্য এই মারণরোগের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হলে একটাই রাস্তা, প্রতিরোধ। বিয়ের আগে যদি নাও করানো যায়, বিয়ের পর-পরই স্বামী-স্ত্রী থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা জানার জন্য HPLC Test অবশ্যই করানো উচিত। দুজনের মধ্যে যে কোনো একজন যদি থ্যালাসেমিয়া মুক্ত থাকেন তাহলেই আর কোনো চিন্তা থাকে না। যদি দুজনেই থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার হন তাহলে দুজনেরই জিন টেস্ট করা প্রয়োজন। তারপর বাচ্চা এলে ভ্রূণের পরীক্ষা করানো অবশ্যকর্তব্য। আর একবার মনে করিয়ে দিই, এই পরীক্ষাগুলো করাতে অন্য কোথাও যেতে হয় না। কলকাতাতেই অন্ততঃপক্ষে দুটি সরকারী হাসপাতালে এই সমস্ত পরীক্ষা করানো যায়। খরচও বেশি নয়। সামান্য একটু সচেতনতা দেখাতে পারলেই থ্যালাসেমিয়ার মতো মারণরোগের প্রতিরোধ করা সম্ভব।

লেখক পরিচিতি: ডা. কাঞ্চন মুখার্জী, এম বি বি এস, এফ আর সি ও জি, ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। তার সঙ্গে সরকারী মেডিকেল কলেজে গর্ভস্থ ভ্রূণের থ্যালাসেমিয়া নির্ণয়ের কাজে যুক্ত আছেন।

শিশুর খাবার— দু'বছর পর্যন্ত

জন্মানোর পর থেকে পাঁচ ছ'মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধই বাচ্চাকে যথেষ্ট পুষ্টি দেয় এবং তা সবচেয়ে নিরাপদ আহারও বটে। তারপর থেকে তাকে আস্তে আস্তে নরম ও আধা-শক্ত খাবার খাওয়াতে হবে। আর মোটামুটি এক বছর বয়স থেকে সে বাড়ির সাধারণ রান্না সবার সঙ্গে বসে খেতে শিখবে। বাচ্চার খাবারের দিকে, তার খাদ্যের পুষ্টি-মূল্যের দিকে নজর রাখতে হবে, কিন্তু নানা বেবিফুড, সুন্দর কৌটো করে আসা কোম্পানির তৈরি নরম খাবার বা স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয় এগুলো খাওয়াবেন না— লিখছেন **ডা. অতনু ভদ্র।**

সবাই খুশি— বাড়ীতে নতুন অতিথি এসেছে। কিন্তু সে খাবে কী? মায়ের দুধ— পেট ভরবে তো? পাশের বাড়ির রীনা বৌদি কৌটোর দুধ (formula milk) নিয়ে এসেছে একটু গুলে খাইয়ে দে— ভালো ঘুমোবে। ঠাকুমা কালো গরুর দুধ দোয়াতে বলেছেন। অথচ হাসপাতাল থেকে ছুটির সময় শিশুডাক্তারের চোখরাঙানি— "শুধু মায়ের দুধ"! নতুন মা কী করবে? তার বাচ্চার সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা কিসের উপর নির্ভর করে?

প্রথম ১-৩ দিন সব মা-রই দুধ কম আসে।

কিন্তু ওই সময় বাচ্চাটির দুধের প্রয়োজনও কম থাকে। তাই বাচ্চার অসুবিধা হয় না। প্রথম দিকের মায়ের দুধকে কোলোস্ট্রাম (colostrum) বলে। এতে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ইমিউনো-গ্লোবিউলিন থাকে।

কি করে মা বুঝবে শিশুর জন্য মায়ের দুধ পর্যাপ্ত হচ্ছে?

একজন শিশু যদি ২৪ ঘন্টায় ৮-১০ বার প্রস্রাব করে তাহলে সে পর্যাপ্ত দুধ খাচ্ছে। শিশু কাঁদছে, রাতে জাগছে বলে মনে হওয়ার কারণ নেই যে শিশুর পেট ভরছে না।

মা কী খাবে? কী খাবে না?

মা-র আহার সুষম এবং সঠিক পরিমাণে লোহা ও ক্যালসিয়ামযুক্ত হতে হবে। মা বাঁধাকপি, ফুলকপি, ঝালমশলা খাবে না। ওইসব খাবার খেলে বাচ্চার পায়খানা পাতলা হতে পারে।

৫-৬ মাস পর বাচ্চা কী কী খাবে?

ফলের রস, ডালের জল দিয়ে বাচ্চা খাওয়া শুরু করবে। তারপর সে ভাত-খিচুড়ি এসব খেতে পারে। অনেকেই বাজার থেকে দুধ ছাড়ানোর সময়কার বিশেষ খাবার কিনে ব্যবহার করেন (Farex, Cerelac, First Food ইত্যাদি) তবে বাড়িতে তৈরি খাবারই এই বয়সী বাচ্চার পক্ষে ভালো। অনেকেরেই 'মুখে ভাত' বলে একটা অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করেন আর সেই অনুষ্ঠানের আগে দুধ ছাড়া অন্য খাবার দিতে চান না। সব কিছুতে আধুনিকা— মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক, ফ্লাইওভার — কিন্তু শিশুকে আধা-শক্ত খাবার দেওয়ার ব্যাপারে আমরা প্রাচীনপন্থী— এমন হওয়ার কোনও যুক্তি নেই।

ফল, রুটির ওপরের অংশ, সুজি, দালিয়া সব কিছুই এবার দেওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে শিশু জন্মেই দুধ খেতে জানে কিন্তু অন্য খাবার খাওয়া তাকে শিখতে হবে। তরল-শক্ত পদার্থ খাওয়া শেখাটাকে weaning বলে।

সঠিক weaning হলে তবেই শিশুর স্বাস্থ্যের এবং মস্তিষ্কের বিকাশ সঠিক হয়। ৫ মাস বয়সে, শিশুর ওজন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং প্রতিদিন প্রায় ৬০০-৭০০ ক্যালোরি দরকার হয়ে পড়ে। যেহেতু মায়ের দুধ থেকে এই সময় পাওয়া যায় মাত্র ৪০০-৫০০ ক্যালোরি, তাই অতিরিক্ত খাদ্য দরকার হয়। তাই পাঁচমাস বয়স থেকেই বাচ্চাকে ফলের রস, ডালের জল দিয়ে শুরু করতে হবে। আর ছ'মাস বয়সে সে খাবে ভাত, খিচুড়ি ইত্যাদি।

শুধু মায়ের দুধ থেকে বাড়ীর সাধারণ খাবার শিশুর খাদ্যে এই পরিবর্তনটা খুব সাবধানে করা উচিত।

৯ মাস থেকে বাচ্চা কী কী খাবে?

মাছ এবং ডিমের (হলুদ) কুসুম শুরু করা যায়। এই সময় দুধ ছাড়া অন্য প্রোটিন দেওয়া যায়। যারা নিরামিষাশী তারা ছানা, পনির দিতে পারেন।

স্বাভাবিক খাদ্য ছাড়া অন্য কৃত্রিম খাবার, টনিক, বড়ি— এসব কি লাগবে?

ভিটামিন ডি, লোহা, ক্যালসিয়াম, ইত্যাদি ছ'মাস বয়সের পর থেকে বাচ্চার দরকার কিন্তু তার জন্য ভিটামিন সিরাপ বা টনিকের প্রয়োজন নেই। সূর্যের আলোতে বাচ্চাকে খেলা করতে দিন— তার চামড়ায় ভিটামিন ডি তৈরি হবে, দেহও মজবুত হবে। দুধের মধ্যে সে পাবে ক্যালসিয়াম, কিছু ফলেও ক্যালসিয়াম আছে। আর লোহা পাবে সাধারণ গুড় থেকে, ডিম থেকে, এবং নানা ফল থেকে, বিশেষ করে খেজুর থেকে।

১-২ বছর বয়সে বাচ্চা কী খাবে?

বাড়ির রান্না সবই খেতে পাবে। এইবার কিন্তু আপনার শিশু বড়ো হচ্ছে। আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে খাবার যেন সুস্বাদু হয় এবং খাবার দেওয়ার পদ্ধতি, যেমন থালা, বাটি, খাবার সাজানো এসব যেন আকর্ষণীয় হয়। বাড়ির সবাই যখন খেতে বসেন, তখন আপনার শিশুটিকেও খাওয়াতে বসাবেন। বাড়ন্ত শিশুর আহারে থাকবে প্রচুর প্রোটিন এবং ভিটামিন। পর্যাপ্ত প্রোটিনের উৎস : ডিম, মাছ, মাংস, সয়াবিন, দুধ। ভিটামিনের উৎস : রঙীন সব্জী এবং ফল। বিজ্ঞাপনে

দেখালেও এখন হেল্‌থ ড্রিঙ্ক (স্বাস্থ্য পানীয়) ব্যবহার করবেন না। অধিকাংশ স্বাস্থ্য পানীয়-এ প্রোটিনের মাত্রা খুব কম থাকে। এবং প্রোটিনের উৎস অনুযায়ী, এই প্রোটিন সর্বোচ্চ পর্যায়ের নয়।

বিশেষ উপাদান:

মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য প্রয়োজন সামুদ্রিক মাছ। এ ছাড়া ভিটামিন ডি-৩, ক্যালসিয়াম, ডিম, দুধ এবং খালিগায়ে সূর্যের আলোতে থাকা শরীরের জন্য প্রয়োজন।

মা-বাবাকে খেয়াল রাখতে হবে :

১. সময় অনুযায়ী খাওয়ানো উচিত।

২. দুটো প্রধান খাবারের মাঝে ছোট টিফিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩. একঘেয়েমি যেন না হয়। মাঝে মাঝেই পরিবর্তন থাকবে।

৪. শিশুকে নিজের হাতে খেতে উৎসাহ দিতে হবে।

৫. 'রেডিমেড খাবার' বা 'ফাস্ট ফুড' এড়িয়ে চলা উচিত।

৬. দিনে অন্তত একবার বাড়ির সবাই একসাথে খাবে।

৭. খাওয়ানো যেন যুদ্ধের পর্যায়ে না যায়। তাহলে কিন্তু শিশুর মানসিক প্রতিক্রিয়া বিরূপ হয়ে সে খাদ্যকে নিজের আবদারকে মেনে নেওয়ার 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করতে শিখবে।

শিশুর স্বাস্থ্য বিকাশ একটা ধারাবাহিক ঘটনা, প্রতি বছরের বিকাশ আগের বছরের বিকাশের উপর তৈরি হয়। তাই প্রতিটি বছরই জরুরী।

- শিশুর পাঁচ-ছ'মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধই যথেষ্ট। কৌটোর দুধ খাওয়াবেন না।
- পাঁচ-ছ'মাস থেকে একবছর বয়স অবধি শিশুকে আস্তে আস্তে প্রথমে তরল খাবার— ফলের রস, ডালের জল, তারপর নরম খাবার— ভাত, খিচুড়ি, ফল, দালিয়া, গুড় এসব খাওয়ান।
- ন'মাস বয়স থেকে বাচ্চা খাবে প্রাণিজ প্রোটিন— ডিম, মাছ, ছানা, পনির। কৌটোর খাবার বা হেল্‌থ ড্রিংক-এর দরকার নেই।
- একবছর থেকে দু'বছর বয়সে বাচ্চা বাড়ির সাধারণ খাবার খেতে শিখবে।

লেখক পরিচিতি : ডাঃ অতনু ভদ্র, এম বি বি এস, ডি সি এইচ শিশুরোগবিশেষজ্ঞ। একটি সরকারী হাসপাতালে শিশুচিকিৎসক।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৪৮ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমাকলীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক। প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

e-mail : aneek.bm@gmail.com

শিক্ষাগ্রহণে অক্ষমতা— Learning Disability

সবাই সবকিছু সমানভাবে শিখতে পারে না। কেউ আঁকা শেখে তাড়াতাড়ি, কিন্তু সাইকেল চড়া শিখতে গিয়ে বারবার আছাড় খায়। আবার কেউ আঁকতে পারে না সহজে, কিন্তু একবেলায় সাইকেল চড়তে শিখে যায়। এটা মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক পার্থক্য, একে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'শিক্ষাগ্রহণে অক্ষমতা' (Learning Disability সংক্ষেপে এল.ডি) বলা যায় না। তাহলে এল ডি কী? আলোচনা করেছেন **জয়তী অধিকারী**।

শিক্ষাগ্রহণে অক্ষমতা' বা লার্নিং ডিজএবিলিটি (এল ডি) হল একটি স্নায়ুঘটিত রোগ। এটি মানুষের জন্ম থেকে বড় হবার পথে বিকাশজনিত এক সমস্যা। মানুষের মস্তিষ্কের কোষগুলি নিজেদের মধ্যে বিপুল ও জটিল বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযোগ বজায় রাখে। মূলত কোষগুলির দেহ তথা কোষপর্দার মধ্যে দিয়ে এই বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে। একজন মানবশিশুর 'শিক্ষাগ্রহণে অক্ষমতা' বা এল ডি হয় তখনই যখন তার মস্তিষ্কের এই বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় তফাৎ এতটাই থাকে যে তার মস্তিষ্কের গঠন ও কাজ অন্য পাঁচজনের চাইতে বেশ আলাদা হয়ে যায়। যেসব বাচ্চাদের এল ডি আছে তারা তাদের বন্ধুদের মতই বুদ্ধিমান, এমনকি কেউ কেউ বন্ধুদের চাইতে বেশি বুদ্ধিমান হয়। কিন্তু তাদের এক একজনের এক একটি বিষয়ে ভীষণ অসুবিধা হয়। কেউ হয়তো পড়তে গিয়ে খুব মুশকিলে পড়ে, কেউ লিখতে অসুবিধায় পড়ে, বানান করতে পারে না, কারো বা অসুবিধা মনে রাখতে অথবা তথ্যগুলি গুছিয়ে বলতে বা লিখতে।

'শিক্ষাগ্রহণে অক্ষমতা' (এল ডি) হয় কেন?

এল ডি-র কারণ এখনও একেবারে নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। তবে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা প্রতিদিনই এ সম্পর্কে আরো বেশি জানতে পারছেন, এবং আমরা আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে কারণটা অনেক স্পষ্ট করে বলতে পারব। এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়—

● এল ডি আক্রান্ত শিশু যে পরিবারে আছে সে পরিবারে আরও কেউ এই রোগে ভুগেছে বা ভুগছে এমন সম্ভাবনা বেশি। অর্থাৎ এ রোগে বংশগতির ভূমিকা আছে।

● গর্ভাবস্থায় বা শিশুর জন্মের সময়ে কোনও অসুবিধা/অসুখ এল ডি-র কারণ হতে পারে।

● জন্মের পরে আঘাত, বিশেষত মাথায় আঘাতের ফলে এল ডি হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে 'অর্জিত' এল ডি বলা হবে, বিকাশজনিত এল ডি নয়।

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে এল ডি কিন্তু অন্য মানসিক অক্ষমতার ফলে হয় এমনটা নয়। যেমন মানসমন্দন (mental retardation), বা অটিজম, বা দৃষ্টিহীনতা, বা বধিরতা— এদের ফলে এল ডি হয় না। তাই এল ডি-কে এসব রোগের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। এবং বলা বাহুল্য পড়াশুনো করার সুযোগ কম পাওয়ার সঙ্গে এল ডি-র কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন ধরুন যেসব বাচ্চার মাতৃভাষা ইংরেজি নয় এবং বাড়িতে ইংরাজিতে কথা বলার চলও নেই, তাদের যদি ইংরেজিতে পড়াশুনো করতে হয় তবে তাদের পড়তে লিখতে অসুবিধা হতেই পারে— সেটা এল ডি নয়।

কতজন বাচ্চা এল ডি-তে আক্রান্ত?

পাশ্চাত্য দেশে এ নিয়ে সমীক্ষা ও গবেষণা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ মানুষ এই অসুখে আক্রান্ত— জানিয়েছেন আমেরিকার ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অফ্ হেলথ। স্কুল-পড়ুয়াদের মধ্যে এল ডি-আক্রান্তদের সংখ্যা শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ। এদের মধ্যে এল ডি-র যে ধরণটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তা হল পাঠ করার অসুবিধা। এল ডি-তে আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই পড়তে অসুবিধা বোধ করে।

এল ডি যাদের আছে তাদের অন্য কোন শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা হতে পারে কি?

হ্যাঁ, অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাক্টিভিটি ডিস্‌অর্ডার, যাকে বাংলায় 'মনোযোগ-অভাব-সহ অতিসক্রিয়তা' বলা যেতে পারে, এ অসুখটা এল ডি-র সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু তা বলে এদুটো একই অসুখ নয়, বা একটা অসুখ অন্য অসুখটার ফলে হচ্ছে তা-ও নয়। তবে এদের সহাবস্থান দুটো অসুখেরই প্রাবল্য বাড়িয়ে দেয়। মুশকিল হল, এল ডি রোগীদের এক-তৃতীয়াংশেরই মনোযোগ -অভাব-সহ অতিসক্রিয়তা অসুখটি আছে।

এল ডি কি সারানো যায়?

না, এটা সম্পূর্ণ সারে না, সারাজীবনই থাকে। কিন্তু ঠিক সময়ে যথাযথ হস্তক্ষেপ ও সাহায্য করলে এল ডি আক্রান্ত বাচ্চারা যে শুধু স্কুলের পড়াটাই করতে পারে তাই নয়, তারা পারে স্বাভাবিক জীবিকা অর্জন করতে, এমনকি অন্যদের চাইতে বেশি প্রতিষ্ঠিতও হতে।

এল ডি কি অনেক ধরনের হয়?

হ্যাঁ। আসলে অনেক ধরনের অক্ষমতার সম্মিলিত নাম হল এল ডি। এইসব অক্ষমতার মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তা হল—

● **পঠন-অক্ষমতা** (Dyslexia) : এতে বাচ্চাদের লিখিত বা ছাপা অক্ষরের শব্দ বুঝতে অসুবিধা

হয়। পঠন-অক্ষমতাকে পঠন-বিকারও (reading disorder) বলা যায়।

● **গণিত-অক্ষমতা** (Dyscalculia) : গণিতে অক্ষমতায় বাচ্চা পাটিগণিতের সহজ গণনা করা বা সমস্যা সমাধান করা, বা গাণিতিক ধারণা বোঝা— এসবে খুব অসুবিধায় পড়ে।

● **লিখন-অক্ষমতা** (Dysgraphia) : বাচ্চা অক্ষর গঠন করতে বা একটা পূর্ব-নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে লিখতে অসুবিধায় পড়ে।

এল ডি-র চিহ্নগুলি কী কী?

এর কিছু অসুবিধা বাচ্চার বয়সের সঙ্গে বা তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। তাই এল ডি-র চিহ্নগুলি বয়সের ওপর নির্ভর করে নানান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ নিজের বাচ্চার মধ্যে নীচের লক্ষণগুলির একটি বা একাধিক লক্ষণ দেখতেই পারেন। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি নীচের লক্ষণগুলির মধ্যে বেশ অনেকগুলি অনেক সময় ধরে কোনো বাচ্চার মধ্যে দেখা যায় তবে তার এল ডি থাকতে পারে।

প্রাথমিক-পূর্ব স্তরে প্রকাশিত লক্ষণসমূহ—

- এরা অধিকাংশ বাচ্চার তুলনায় বেশি বয়সে কথা বলতে শেখে।
- ঠিক শব্দটা চট করে বলতে অসুবিধা হয়।
- ছন্দ মিলিয়ে শব্দ বলতে অসুবিধা হয়।
- সংখ্যা শিখতে, অক্ষর চিনতে, নানা ধরনের আকার চিনতে অসুবিধা হয়।
- খুব সহজে মনোযোগ চলে যায়।
- দিক-নির্দেশ অনুসরণ করতে অসুবিধা হয়।
- পেশির সূক্ষ্ম সঞ্চালন প্রয়োজন হয় এমন সব দক্ষতাগুলো ভালোভাবে বিকশিত হয় না।

প্রাথমিক স্তরে প্রকাশিত লক্ষণসমূহ—

- অক্ষর আর তার ধ্বনি (উচ্চারণ)-র মধ্যে যোগ বুঝতে অসুবিধা হয়।
- প্রাথমিক স্তরের শব্দগুলো (যেমন খাও, যাও) পড়তে পারে না।
- সমানে পড়া আর বানানে ভুল করা। বিশেষ করে অক্ষর বিপ্রতীপ করে লেখা (যেমন b-এর জায়গায় d), উল্টো করে লেখা (M-এর জায়গায় W), বর্ণবিপর্যয় (FELT-এর জায়গায় LEFT) বা শব্দ বদলে দেওয়া (HOUSE-এর বদলে HOME)।
- সংখ্যার ক্রমবিন্যাস পরিবর্তন করা, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের চিহ্ন (+, –, x, ÷) গুলিয়ে ফেলা।
- তথ্য ভুলে যাওয়া।
- নতুন দক্ষতা শিখতে দেরি হওয়া, পড়া 'মুখস্থ' করার চেষ্টা।
- পরিকল্পনাবিহীন ভাবে কাজ করা।
- পেন্সিল ঠিকভাবে ধরতে না পারা।
- 'সময়'-এর ধারণা বুঝতে অসুবিধা।
- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজে সমন্বয়ের অভাব, নানা জিনিসে ধাক্কা লাগা, দুর্ঘটনা।

ষষ্ঠশ্রেণী— অষ্টম শ্রেণী

- বর্ণবিপর্যয় (LEFT এর বদলে FELT)।
- শব্দের মূল, উপসর্গ ও অনুসর্গ বোঝায় অসুবিধা, বানান-এর অন্যান্য নিয়ম বুঝতে অসুবিধা।
- জোরে পড়া এড়িয়ে চলা।
- লেখা এড়িয়ে যাওয়া।
- হাতের লেখায় অসুবিধা।
- শব্দের অঙ্ক-য় অসুবিধা।
- চট করে পড়া মনে না পড়া।
- বন্ধুত্ব স্থাপনে অসুবিধা।
- শরীরি ভাষা, মুখভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা।

নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী এবং প্রাপ্তবয়স্ক

- বানানে ভুল হতেই থাকা; একই লেখায় একটা শব্দ নানা বানানে লেখা।
- পড়া বা লেখার কাজ এড়ানো।
- গুছিয়ে বলা বা লেখায় অসুবিধা।
- আস্তে আস্তে কাজ করা।
- বিমূর্ত ধারণা বুঝতে অসুবিধা।
- খুঁটিয়ে মনোযোগ না দেওয়া বা একটা জিনিসেই অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া।
- তথ্য ভুল বোঝা।

ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করবেন কে?

এই কাজে মা-বাবা ও স্কুলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এল ডি বাচ্চাদের ক্ষমতাগুলোকে সবথেকে আগে চিহ্নিত করতে হবে। তারপর তার অসুবিধাগুলোকে জানতে হবে। বাচ্চাটির কিসে বিশেষ দক্ষতা আর কিসে অসুবিধা— এ দুটোই জানা দরকার। যত কম বয়সে এগুলো চিহ্নিত করা যাবে বাচ্চাটির পক্ষে ততই ভাল।

এই প্রাথমিক চিহ্নিতকরণের পরে বাচ্চাটিকে সাহায্য করার জন্য মা-বাবা আর স্কুলের কী করা উচিত?

এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জরুরী কথাটা হল— তাড়াতাড়ি সাহায্যের ব্যবস্থা করা। নিজের বাচ্চাটির পড়তে লিখতে অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারলেই মা-বাবার উচিত স্কুলের সঙ্গে যোগযোগ করা, স্কুলের পরামর্শ নেওয়া। এবং এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে হয় স্কুলের মাধ্যমে বা তাঁদের ক্লিনিকে গিয়ে দেখা করে বাচ্চাটির পরীক্ষা করানো, ও তার ফল নিয়ে সবাই এক সাথে মিলে আলোচনা করা। এই পদক্ষেপটি কত আগে বা কত দেরীতে নেওয়া হচ্ছে তার ওপর বাচ্চার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আমেরিকার 'ন্যাশানাল ইন্‌স্টিটিউট অফ্ হেল্‌থ'-এর সমীক্ষায় দেখা গেছে যেসব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরে পঠন অক্ষমতা চিহ্নিত করে পঠন-এর জন্য নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে শেখানো হয়েছে, ক্লাস সিক্স থেকে এইটে গিয়ে তারা অন্যসব বাচ্চাদের মতোই পড়তে পারছে, এমনকি তাদের চাইতে ভালোই পড়ছে হয়তো।

যে মা-বাবার বাচ্চার এল ডি চিহ্নিত হয়েছে, সে মা-বাবারা যদি এল ডি নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে পারেন তো ভাল হয়। মা-বাবারা বিষয়টি নিজেরা যত জানতে-বুঝতে পারবেন ততই তাঁরা সন্তানকে সাহায্য করতে পারবেন। স্কুলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাহায্য করুন। বিশেষজ্ঞদের মতামত নিন। অন্য যেসব বাচ্চার এল ডি আছে তাদের মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করলে এবং নানা দলের সঙ্গে মিশে চেষ্টা করলে এ বিষয়ে মা-বাবারা বেশি জানবেন বুঝবেন, মানুষের ভুল ধারণাগুলো মুছে দিতে পারবেন। এমনকি সব মা বাবারা একযোগে শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্তনও আনতে পারবেন।

লেখক পরিচিতি: জয়তী অধিকারী, এম এড (এস এন ডি টি উইমেনস্' ইউনিভার্সিটি, মুম্বই), এম সেন (মাস্টার্স ইন স্পেশাল এডুকেশন নীডস্, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রোগ্রাম)। বর্তমানে শিক্ষাগ্রহণে অক্ষমতা আছে এমন বাচ্চাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা তৈরি করা ও তাদের শেখানোর কাজে যুক্ত আছেন কলকাতার একটি বেসরকারী ক্লিনিকে এবং হাওড়া জেলায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ক্লিনিকে।

আমার বড় হয়ে ওঠা

সায়ন্তন বোস

আমার শৈশব থেকে বাল্যকাল—এই যা মুলাকাৎ আমার দাদু কবি বিষ্ণু দে এবং ঠাকুরদা পেন্টার অতুল বসুর সাথে। আমি যে সময় জন্মগ্রহণ করি ক্যারিয়ার নামক বস্তুটি তখনও জীবনে এত প্রকট হয়নি এবং আমাকে বলা হয়েছিল যে ভালো করে জ্ঞান সঞ্চয়ন করলেই জীবনে ভালোভাবে বাঁচা যায়। আমি তাই-ই করি। উপরন্তু পড়াশোনায় মোটামুটি ভালো হওয়া, এবং ব্যবহার ভালো থাকার দরুণ আমি ইস্কুলে স্যারদের এবং মিস্‌দের স্নেহভাজন হই এবং বাড়িতেও দাদু-দিদা, ঠাকুরদা-ঠাকুমার ভালোবাসা পাই। সব মিলিয়ে পাই এক আনন্দিত-সুন্দর

বাল্যকাল। এখানে আমার ব্যাপারে একটা মজার তথ্য জানাই — আমাদের বাড়িতে ডাকার নামগুলো একটু অদ্ভুত ধরনের — যেমন আমি ঠাকুরদাকে ডাকি দাদু, দাদামশায়কে দানদানি, দিদিমাকে তানতামা। মানে সায়ন্তনের কাছে অতুল বসু স্পেসিফায়েড থাকেন 'দাদু' হিসেবে, বিষ্ণু দে 'দানদানি' হিসেবে। স্মৃতি রোমন্থন করে দেখতে পাই মামাবাড়িতে একাধিক বা প্রচুর গান-কবিতার আসর, যেখানে উপস্থিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র, অর্ঘ্য সেন, দেবব্রত বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং আরও অনেকে। আর নিজেদের বাড়িতে দেখতে পাই সব বড়-বড় গাড়ি করে লোকজনের আবির্ভাব যার মধ্যে একজন ইন্দিরা গান্ধী এবং আরেকজন ড. অশোক মিত্র। এই পারিবারিক বৈচিত্র্যের জন্য আমার ছোটবেলার বন্ধু হয় অধুনাখ্যাত নন্দনা সেন ওরফে টুম্পা, টুম্পার দিদি পিকোদি ওরফে অন্তরা সেন, এবং সেই সময় থেকেই আমি পরিচিত অমর্ত্য সেনের।

ক্রমশ বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি কৌতুহলবশত সঙ্গদোষে পড়ি এবং আস্তে আস্তে হয়ে উঠি এক নেশাড়ি। এবং তারপর নেশাজনিত কারণে মানসিক রোগী। এমনিতে ছোটবেলা থেকেই আমি একটু ফাঁকিবাজ এবং আমার টিচাররা বলতেন যে এ যদি ফাঁকি কম দেয় তো ফার্স্ট হতে পারে। আমি দুবার হইও — এবার ক্লাস এইটে এবং একবার ক্লাস টেনে, টেস্টে অঙ্কে পাই একশ-এ একশ। পরবর্তী কালে উচ্চমাধ্যমিকে খারাপ ফল আসে— বিষয় ছিল অর্থনীতি— এবং বাবার সাহায্যে ১৯৮৯ সালে ব্যাঙ্গালোর পাড়ি দি অর্থনীতি নিয়ে স্নাতক করতে। আমার জন্ম ১৯৬৯ সালে। মাধ্যমিক ১৯৮৬ এবং উচ্চমাধ্যমিক ১৯৮৯। এর মধ্যে অলরেডি আমি নেশার জীবনে অনুপ্রবেশ করি। বিভিন্ন জনপদে মিশে আজ আমি ''মেসেজ'' পেয়েছি এক সুন্দর মিড-ওয়ে হোমের যেখানে শুধু নেশাড়িরাই যেতে পারে এবং এক সুন্দর ফ্রি জীবন পেতে পারে — এটি ১৯৮৭-এর ঘটনা।

আমার ভাই জন্মগত মানসিক রোগী। ১৯৮৯-এ আমার বাবা এবং ভাই ব্যাঙ্গালোর যায় স্বনামধন্য সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. রবিলাল কাপুরের কাছে চিকিৎসা করাতে।

সেখানে কেউ অতুল বসু বা বিষ্ণু দের নাম শোনেনি তাই সেখানে আমরা পাই সাধারণ মানুষের জীবন। উপরন্তু আমি নিজে অতুল বসু বিষ্ণু দের জীবনধারা সম্পর্কে খুব ওয়াকিবহাল নই ফলতঃ আমি নিজের মত বড় হই। একটা কথা বলা হয়নি— আমরা ব্যাঙ্গালোরে যে কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিনি তা নয় — বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রঞ্জন ঘোষাল (মহীনের ঘোড়াগুলি খ্যাত) এবং সুমতিন্দ্র নাদিগের (কন্নড় সাহিত্যিক) সাহায্যে কিছু কবিতা উৎসব সংগঠিত করেন আমার মা, এবং কিছু গায়ক সাহিত্যিক সে সময়ে আমাদের কাছে ওঠেন যেমন শরৎ মুখোপাধ্যায়, সুবিনয় রায় প্রমুখ। এই বিবরণ লিখতে লিখতে আমার এক গানের কলি মনে আসছে —

''তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মন জানো না
তোমার ঘরে বসত করে নয় জনা...''

আজকে সভ্যতার অবক্ষয়ের কারণে বেশি লোক কবি-সম্মেলন এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনেন না, ফলতঃ এই অনুষ্ঠানগুলি খুব যে খ্যাত হয় তা নয়, কিন্তু কিছু পুস্তিকায় তা থেকে যায়।

এই মোটামুটি আমার জীবনপঞ্জিকা এখনকার মতো, কারণ ultimatum দিয়ে লেখা সবসময়ে তৈরী হয় না এবং সেই সুবিখ্যাত কথাটাও থেকে যায়

".... and I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep"

সংযোজন

ডা. সুমিত দাশ

'ইউজার... পিক আপ... ক্লিন' — কথাগুলোর সম্পর্ক বোধ হয় ঠিক বোঝা গেল না। অনেকটা সিনেমার শ্যুটিং-এর 'লাইট... ক্যামেরা... অ্যাকশন' — শব্দবন্ধনীর মত লাগছে, তাই না? অথচ প্রকৃত বাস্তবে, চলচ্চিত্রের আলোকজ্জ্বল দিকের ঠিক বিপরীত এক অন্ধকার জগতের দিক নির্দেশ করে প্রথমোক্ত শব্দবন্ধনী। এর জগৎ 'নেশাড়ি'দের জগৎ, যাদের আমরা সাধারণ ভাবে 'অ্যাডিক্ট' বলি। এই নেশাড়িরা যাঁরা চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন নেশা ছাড়ানোর 'সেন্টার'-এ ভর্তি হন, তাঁদের কাছে শব্দগুলো খুব পরিচিত। যাঁরা নেশা করছেন তাঁরা হচ্ছে 'ইউজার', যখন

নেশাড়িদের নেশা ছাড়ানোর সেন্টারে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে বলে ‘পিক-আপ’, আর তাঁরা যে সময়টা নেশামুক্ত থাকেন সেটা হচ্ছে ‘ক্লিন’।

উপরের লেখার লেখক সায়ন্তন বোসের জীবনও এই আবর্তেই ঘুরপাক খাচ্ছে। মূলত বন্ধুদের সঙ্গে কৌতূহলবশত ক্লাস টেন-এ নেশায় হাতেখড়ি। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত, সাথে সাথে ধরল এক মানসিক সমস্যা। এই মানসিক সমস্যাগুলি হল — স্বাভাবিকের তুলনায় অতি উৎফুল্ল মেজাজে থাকা, বেশী কথা বলা, খরচ করে ফেলা, নিদ্রাহীনতা, মনোযোগের অভাব, এক বিষয়ে মনস্থির করে থাকার অক্ষমতা ইত্যাদি। সায়ন্তনকে আরো বিস্তৃতভাবে আরো কিছু বিষয়কে কভার করে লিখতে বলেছিলাম কিন্তু উনি নিজের মত লিখেছেন, আমাকে পাত্তা না দিয়ে। এক জায়গায় লিখেছেন “...ultimatum দিয়ে লেখা সবসময় তৈরী হয় না”। তাড়াটা আমার দিক থেকে ছিল। ওনাকে অনেকটা সময় দেওয়া সত্ত্বেও লিখছিলেন না বলে তাড়া দিয়েছিলাম। এই লেখার মধ্যে দিয়ে উনি নিজের মুক্তি খানিকটা খুঁজে পেয়েছেন। আর পাঁচজনের সঙ্গে নিজের কথা বলতে পেরে কিছুটা যেন ভারমুক্ত হতে পেরেছেন। এও ওঁর জন্য একধরনের থেরাপি। আর পাঠকের জন্য এ-এক মন-বোঝাবুঝির সূচনা। আমাদের ভালবাসার জনের দিকে হাত বাড়িয়ে দেবার কথা বোঝা। অন্যকে বোঝা, নেশাড়ি বলে তাকে আলাদা করার কারণ নেই, সেটা বোঝা।

আমার বিশ্বাস গত কুড়ি বছরের মধ্যে সায়ন্তন অন্তত দশ বছর বিভিন্ন সেন্টারে ভর্তি থেকেছেন। যখন নেশামুক্ত থেকেছেন, কাজ করেছেন মূলত সেলসের। বর্তমানে তিনদিন একটা সেন্টারে ভর্তি থাকেন, তিনদিন বাড়ি থাকেন। এবার সেল করছেন ওষুধ। ১৩ মাস ‘ক্লিন’ আছেন। খুব ইচ্ছা তিন বছর ক্লিন থাকলে নিজের আয় করা টাকায় প্রিয়জনদের নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করা — মূলত হবে খাওয়া দাওয়া। আমাদের শুভেচ্ছা রইল সায়ন্তনের প্রতি — উনি এভাবে ভালো থাকবেন এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার আশা সায়ন্তনদের মত আরো অসংখ্য ছেলে মেয়েদের ঘিরে — যাঁদের পাশে আমরা দাঁড়ালে তাঁরা নেশামুক্ত জীবনে ফিরে আসবেন।

advt.

With Best Compliments from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.

P-77, Kalindi Housing Estate
Kolkata- 700089

রোগ ধরার যন্ত্র কতটা নিরাপদ

ডাক্তারবাবুরা এখন ক্রমশ বেশী বেশী করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ নির্ধারণ ও চিকিৎসা করেন। বিভিন্ন ধরনের 'ইমেজিং টেকনিক', যেমন এক্স-রে, ইউ এস জি, সি টি স্ক্যান, এম আর আই করে তাঁরা শরীরের গভীরের হাল-হকিকত জেনে নেন। কিন্তু এইসব পরীক্ষায় রোগীর কিছু ঝুঁকি আছে, যদিও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে ঝুঁকি কমেছে— লিখছেন **ডা. প্রদীপ সাহা।**

আমি যখন সরকারি হাসপাতালে চাকরি করতাম তখন আমাদের ডিপার্টমেন্টে এক এক্স-রে টেকনিশিয়ান ছিলেন, যাঁর কাজ ছিল রোগীদের এক্স-রে ছবি তোলা। বয়স্ক, এমনিতে চুপচাপ নিরীহ ভালমানুষ গোছের, কিন্তু তাঁর যখন এক্স-রে ছবি তোলার পালা আসত তখন তিনি বেচারি রোগীদের কাছ থেকে রিকুইজিশন ফর্মটি নিয়ে চলে যেতেন, আর তারপর সে ফর্মের খোঁজ পাওয়া যেত না। তার কয়েক ঘণ্টা পরে হয়তো দেখা গেল ফর্মগুলো মিটার বক্সের পেছনে অন্ধকার কোণে পড়ে আছে। অথচ ভদ্রলোক যে সব ব্যাপারে ফাঁকিবাজ ছিলেন তা নয়। তাঁর কোনও এক সহকর্মী বন্ধুর লিউকেমিয়া হয়েছিল, আর বই-পত্রপত্রিকা পড়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে এক্স-রে থেকে নানান ক্যানসার হয়। ব্যাস্, তাঁর মনে এমন আতঙ্ক ঢুকে গেল যে তিনি আর কিছুতেই এক্স-রে করতে চাইতেন না, পালিয়ে বেড়াতেন।

কথা হল, এই আশঙ্কা কি অমূলক? না, একে একেবারে অমূলক বলা যাবে না। এক্স-রে জাতীয় বিকিরণে নানা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। একটা এক্সরে করলে টেকনিশিয়ানের শরীরে যতটা বিকিরণ যায় তার চাইতে ঢের বেশি যায় রোগীর শরীরে। কিন্তু টেকনিশিয়ানকে তো দিনের পর দিন অনেক এক্সরে করতে হয়, তাই সব মিলিয়ে তার শরীরে বিকিরণ ঢোকে বেশি, বিপদের সম্ভাবনাও বেশি।

কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা ঠিক কতটুকু? রোগ ধরতে গিয়ে আমরা কি অন্যদিক দিয়ে রোগীর ক্ষতিই করে দিচ্ছি? আসুন খতিয়ে দেখা যাক।

৮ই নভেম্বর ১৮৯৫-এ রোয়েন্তজেনের এক্স-রে আবিষ্কারের সময়কার মেশিনের থেকে আজকের মেশিন অনেক উন্নত। প্রথম দিককার এক্সরে মেশিনে যেভাবে ডাক্তার বা টেকনিশিয়ানের হাত ইত্যাদি পুড়ে যেত, বা তাঁরা ক্যান্সারে আক্রান্ত হতেন, আজকালকার মেশিনে সেরকম বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই এই মেশিনে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবের গুরুত্ব আমরা হিরোশিমা-নাগাসাকিতে জীবিত মানুষদের ওপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব বিশ্লেষণ করে তবে বুঝতে পারি। আবহাওয়ায় মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়তা আমাদের সবসময় প্রভাবিত করে। যে কোনো তেজস্ক্রিয়তা বেশি পরিমাণে হলে কোষগুলিকে ধ্বংস করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নষ্ট কোষকে সরিয়ে শরীর নিজেকে সারিয়ে তোলে। তা না হলে হয় দেহে ক্ষয়িষ্ণু রোগ নয়তো বা ক্যানসারের সৃষ্টি হয়।

- এক্স-রে, সিটি, ইউ এস জি এবং এম আর আই করে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসায় অনেক সুবিধা হয়।
- এইসব প্রক্রিয়ার কিছু ক্ষতিকর প্রভাব রোগীর শরীরে পড়ে— সেগুলো জানা দরকার।
- যথাযথ প্রয়োজনে ব্যবহার করলে এই ক্ষতিকর প্রভাবের তুলনায় রোগীর চিকিৎসার সুবিধাজনিত লাভ অনেক বেশি।

বর্তমানে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত এক্সরে মেশিন থেকে যা বিকিরণ শরীরে যায় তা অনেক ক্ষীণ। বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলে যে যাঁরা মেডিক্যাল এক্সরে নিয়ে দৈনন্দিন কাজ করেন তাঁদের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের তুলনায় ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা সামান্য বেশি। এ পরিসংখ্যানও একটু পুরনো— সে সময় ডাক্তারদের বেরিয়াম পরীক্ষা ফ্লুরোস্কোপিতে করতে হত।

পরিসংখ্যান বলে যে শরীরে যদি ৫০০০ মিলি রেম (৫০ msv) তেজস্ক্রিয়তা এক বছরে ঢোকে তাহলে আমাদের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা ০.৩ শতাংশ বাড়বে। তার অর্থ আমরা যদি বছরে তিনশ বার এক্সরে করাই তাহলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা এক শতাংশ বাড়বে। একটা তুলনা টেনে বলতে পারি, অ্যাটম বোমার ফলে হিরোশিমা-নাগাসাকিতে জীবিত মানুষরা সর্বনিম্ন যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়েছিলেন বলে মাপা গেছে তার পরিমাণ ৫ থেকে ২০ msv, অর্থাৎ বুকের এক্সরে ৫০০ বার করলে যতটা তেজস্ক্রিয়তা হয় তার চেয়েও বেশি!

সাধারণ এক্স-রে ছবি—

এক্স-রে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব সংক্ষেপে প্রকাশ এইভাবে করা যায়—

১. বুকের, দাঁতের বা হাড়ের একটি এক্স-রের ক্ষতিকারক প্রভাব কিছুদিনের সৌর তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকারক প্রভাবের সমান এবং তাতে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা দশ লাখে এক।

২. মাথা ও ঘাড়ের এক্স-রে কয়েক সপ্তাহের সৌর তেজস্ক্রিয়তার সমান এবং তাতে ১ লাখ থেকে দশ লাখের একভাগ সম্ভাবনা ক্যান্সার হওয়ার।

৩. স্তনের এক্স-রে (mammography), পিঠের (lumbar spine) বা জঙ্ঘার (hip), তলপেটের (pelvis) এক্স-রে জনিত ঝুঁকি কয়েক মাস থেকে দু-এক বছরের মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়তার সমান এবং তাতে দশ হাজার থেকে এক লাখে এক জনের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. যে সব এক্স-রে করার সময় contrast অর্থাৎ কেমিক্যাল রং শরীরের ভেতরে ব্যবহার করা হয় যেমন barium study, intravenous pyelography (IVP বা IVU) তা কয়েক বছরের মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়তার সমান এবং তাতে এক হাজার থেকে দশ হাজারে একজনের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এসব পরিসংখ্যান আগেকার এক্সরে মেশিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সর্বাধুনিক মেশিনে এক্সরে ফিল্মের জায়গা নিয়েছে ডিটেক্টর। তাতে তেজস্ক্রিয়তা অনেকাংশে কম। তাও মানুষের মনে দ্বিধা থেকে যায়।

সিটি স্ক্যান

এক্স-রেকে ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে কম্পিউটার টোমোগ্রাফি (CT)। এতে এক্স-রে টিউব, ডিটেক্টর আর কম্পিউটারের সাহায্যে শরীরের নানা অংশের বিস্তারিত ছবি আমরা দেখতে পাই এবং তা রোগ নির্ণয় করতে সাহায্য করে। বর্তমানের

পরীক্ষা	তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ	একটি বুকের এক্স-রের তুলনায় তা কতগুণ?	তা কতদিনের মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণের সঙ্গে সমান?
বুকের এক্স-রে	০.০২ msv	১	২.৪ দিন
মাথার এক্স-রে	০.১ msv	৫	১২ দিন
পিঠের এক্স-রে	১.৫ msv	৭৫	১৮২ দিন
IVU	৩ msv	১৫০	১ বছর
Upper G I Barium Study	৬ msv	৩০০	২ বছর
Ba enema	৮ msv	৪০০	২.৭ বছর
সিটি— মাথার	২.০ msv	১০০	২৪৩ দিন
সিটি— পেটের	৮ msv	৪০০	২.৭ বছর

সূত্র : Fred A, ''Effective doses in Radiology in Diagnostic and Nuclear Medicine; A Catalog. Radiology, Vol. 248, No- 1. Pg- 254-263, July 2008.

উন্নত ১২৮ বা ২৫৬ স্লাইস মেশিনে সব রকমের পরীক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে, তাতে সময় কম লাগে এবং তেজস্ক্রিয়তা কম হয়।

আগেকার একটা সিটি পরীক্ষায় ১০০০ মিলিরেম (10 msv) তেজস্ক্রিয়তা হত।

এক্স-রে এবং সিটি স্ক্যানের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ যা দাঁড়ায় তা সংক্ষেপে ওপরে পাতায় দেওয়া হল।

প্রখ্যাত 'টাইমস' ম্যাগাজিনে কিছুদিন আগে সিটি-র তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে খবর বেরতেই পাশ্চাত্যে সিটি পরীক্ষার হার অনেকাংশে কমে গেছে। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে সাবধান হওয়ার যুগ শুরু হল!

ইউ এস জি

বিশেষ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে ছবি তৈরি বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। আল্ট্রাসাউন্ড, যা আমাদের শ্রবণসীমার বাইরে, ২০,০০০ হার্জের বেশি কম্পাঙ্কের সেই শব্দোত্তর তরঙ্গকে ব্যবহার করে শরীরের প্রত্যন্ত অংশকে দেখার সুযোগ এখন আমাদের হাতে। এতে সহজে এবং কম খরচে রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গের বিশেষ ধরনের ব্যবহার করে ডপলার ছবির সাহায্যে রক্তের প্রবাহ এবং রক্তনালীর বিস্তারিত অবয়ব দেখা সম্ভব। প্রথমে আল্ট্রাসাউণ্ডের তেমন কুফল না জানা গেলেও পরের দিকে নানা পরীক্ষায় কিছু সমস্যা জানা গিয়েছে। শব্দোত্তর তরঙ্গ শরীরে উত্তাপ তৈরি করে। সাথে সাথে কোষে গহ্বর তৈরি হবার ফলে কোষের ক্ষতি হতে পারে। কিছু পরীক্ষা ভ্রূণের সম্ভাব্য জিনগত ক্ষতির কথাও তুলছে। কারোর কারো মতে এতে ভ্রূণের স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার ফলে বাচ্চার কথা বলতে দেরী হওয়া, ডিসলেক্সিয়া, বৃদ্ধির ক্ষতি, অটিজম, বা ডানহাতি না হবার প্রবণতা— এগুলো বাড়তে পারে। তবে বিজ্ঞানীমহল তথা চিকিৎসকমহল ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে এখনও একমত নন— সম্ভবত ক্ষতির সম্ভাবনা সামান্যই। এসব ভাবনা থেকে মেশিনে কিছু মাপন-পরিমাণ বা index ধার্য করা হয়েছে— থার্মাল ইন্ডেক্স (TI) এবং মেকানিকাল ইন্ডেক্স (MI)। এ দুটোকে কমের দিকে রাখা প্রয়োজন।

এম আর আই

নানা রোগ-নির্ধারক আবিষ্কারের মত ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং (MRI) রোগ নির্ধারণের এক অভিনব পদ্ধতি। এতে কোনো তেজস্ক্রিয়তা নেই। ম্যাগনেট অর্থাৎ চুম্বকের (0.2 testa থেকে 3 শক্তিসম্পন্ন) মধ্যে রোগীকে রেখে, তারপরে রেডিওফ্রিকোয়েন্সি পালস দিয়ে ছবি তৈরি হয়। বিভিন্ন তলে যেমন axial, sagittal, coronal এবং বিভিন্ন রকমের যেমন T_1, T_2, PD, GRE, Flair, STIR ইত্যাদি ধরনের ছবি তোলার কায়দা রয়েছে। এতে শরীরের নানা অঙ্গ, রোগের রকমফের এবং তার বিস্তৃতি দেখা সম্ভব। এখন তো মস্তিষ্কের নানা রাসায়নিক পরিবর্তনও দেখা সম্ভব হচ্ছে। বলা হচ্ছে অ্যালঝেইমার রোগও এই এম আর আই করে নির্ণয় করা সম্ভব।

এম আর আই-এর সেভাবে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া জানা নেই যদিও কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা হতে পারে। রোগীর claustrophobia (বদ্ধ জায়গায় থাকার ভয়) হতে পারে। তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাপ তৈরি হতে পারে। হার্টের পেসমেকার এবং শরীরে কৃত্রিম উপায়ে ঢোকানো প্যারাম্যাগনেটিক জিনিস থাকলে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

শেষ কথা

অতএব আলোচনার শেষে আমরা এটুকু বুঝতে পারছি যে প্রয়োজনে ব্যবহার করলে রেডিওলজির বিভিন্ন রোগ-নির্ধারক প্রক্রিয়ার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুবই সীমিত। এদের সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় ভীতি থাকা উচিত নয়। যেমন হালে আমার শিক্ষিত বন্ধু প্রলয় তার ছেলের MRI করানোর আগে বহুবার জানতে চাইল এতে তার ছেলের ক্ষতি হবে না তো? জানতে চাওয়া খারাপ নয়, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে জীবনের যে কোনও পদক্ষেপ আসলে ঝুঁকির ব্যাপার। বাচ্চাদের স্কুলে পাঠালে গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তা বলে কি আমরা বাচ্চাকে বাড়িতেই রেখে দেব? নিশ্চয়ই দেব না। কারণ দুর্ঘটনা হবার সম্ভাবনা অল্প, আর বাচ্চা শিক্ষিত হলে তার লাভ অনেক। তেমনি সামান্য ঝুঁকি আছে বলে পরীক্ষা করাব না, সেটা ভাবলে বোকামো হবে। কেননা ঐ পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু যদি ঠিকভাবে রোগনির্ণয় করতে পারেন তবে রোগীর লাভ হবার সম্ভাবনা অনেকগুণ বেশি।

সব আবিষ্কারের মতই এইসব অভূতপূর্ব অগ্রগতির ব্যবসায়িক ব্যবহার হলে সেই সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান তার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে লাভের যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে। কোনও কোনও ডাক্তারবাবুরা ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি থেকে এইসব পরীক্ষা প্রয়োজনের চাইতে বেশি করে করাচ্ছেন। তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ভাবছেন না। আমাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া দরকার অপ্রয়োজনে প্রযুক্তির অপব্যবহার বন্ধ হোক, মানুষের আবিষ্কার লাগুক মানুষের প্রয়োজনে।

লেখক পরিচিতি: ডা. প্রদীপ সাহা, এম বি বি এস, এম ডি, একজন রেডিওলজিস্ট। বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এক্স-রে, ইউ এস জি, সিটি, এম আর আই পরীক্ষা করেন।

একজন অন্যধারার মানুষ
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫০-২০০৮)

পবন মুখোপাধ্যায়

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের একটি নাম। উৎসমানুষ পত্রিকা ও অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সমার্থক শব্দ। আলাদা করা যায় না— অশোকের কথা বলতে গেলে উৎসমানুষকে বাদ দিয়ে বলা যাবে না। জানিনা, অন্যান্য পত্রিকার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সেই সংগঠনের এমন নৈকট্য খুব একটা নজরে পড়ে কি না!

সত্তর-দশকের শেষ-পর্বে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয়— তারপর আলাপ-সহযাত্রা দীর্ঘ কুড়ি বছরের বেশি। আমি চাকরিসূত্রে তখন বিড়লা মিউজিয়ামে (বি আই টি এম)। সেই সময় বিড়লা মিউজিয়ামের কর্মীবন্ধুরা একটা হাউস ম্যাগাজিন বের করত। নাম— বিজ্ঞানী। এটা হয়ত বিজ্ঞান আন্দোলনের অনেক কর্মী-বন্ধু-সংগঠকরা জানেন না। সেই 'বিজ্ঞানী' পত্রিকাটি বেশ কিছুদিন লেখার অভাব, উদ্যোগ, সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি আগে কখনও পত্রিকা প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে কর্মীবন্ধুরা সবাই মিলে আমাকে দায়িত্ব দিল 'বিজ্ঞানী' পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশ করা যায় কিনা— দেখার জন্য। সেই থেকে বিজ্ঞানী পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হতে শুরু করল। ঠিক এই সময় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বিড়লা মিউজিয়ামে 'গাইড লেকচারার' পদে যোগ দিল।

সেটা একটা গল্প বা ঘটনা। সেই ঘটনা একটু বলা দরকার। তা না হলে অশোককে চেনা যাবে না, ধরা যাবে না। অশোকের চরিত্রে একটা ক্ষ্যাপামি ছিল, একটা দৃঢ়তা ছিল, ছিল না অন্যায়ের সঙ্গে আপস করা। ফলত চাকরির ক্ষেত্রে যেটা হওয়া স্বাভাবিক— সেটাই হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য, ঝঞ্ঝাট। চাকরি থেকে ইস্তফা। বারবার ঘটেছে। বিড়লা মিউজিয়ামে চাকরি করার আগে অশোক চাকরি করত আকাশবাণীতে, বিজ্ঞান বিভাগে। অশোকের বিজ্ঞানবিষয়ক কথিকা নতুন প্রাণ এনেছিল। তার কথার বাঁধন, ভাষা, সরলতা সঞ্চারিত হত সেই সময় বিজ্ঞান বিভাগের বিজ্ঞান কথিকাগুলোতে। আমাদের দেশে বিজ্ঞান সাংবাদিকতার একটা অন্যমাত্রা অশোক সংযোজন করেছিল। অশোক আকাশবাণীতে চাকরি করার সময় একটা ঘটনা

ঘটে। সেইসময় অশোক খুঁজে খুঁজে বেশ কিছু ব্যক্তিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছিল— যাঁরা 'স্বভাব বিজ্ঞানী', যাঁরা অজ্ঞতা, অন্ধত্ব, কুসংস্কারকে দু'হাতে সরিয়ে আলোর পথযাত্রী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, সর্প বিশারদ অবনী ঘোষ, স্বভাব কৃষিবিজ্ঞানী শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

একদিন শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুরের একটি কথিকা আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগে অশোক প্রচারিত করল— 'শালগ্রাম শিলার বিজ্ঞানরহস্য'। এই কথিকার একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া শ্রোতা সমাজে প্রতিফলিত হলো। ধর্মীয় ভাবাপন্ন মানুষের প্রতিক্রিয়া ততটাই জোরালো ছিলো যে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ অশোককে দুঃখপ্রকাশ করতে বললো এবং এই ধরনের ধর্মীয় ভাবাবেগকে আক্রমণ করার জন্যে ক্ষমা চাইতে বললো।

এক্ষেত্রে আর পাঁচটা চাকুরে মানুষের মতো অশোক দুঃখ প্রকাশ করে চাকরি বজায় রাখতে পারত এবং পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি করে নিজের ভবিষ্যত সুদৃঢ় করতে পারত। অশোক সেই স্বভাবের মানুষ ছিল না। তাই, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পথে না হেঁটে— চাকরিতে ইস্তফা দিল। চাকরি নিল গ্ল্যামারহীন গাইড লেকচারার পদে— বিড়লা মিউজিয়ামে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিড়লা মিউজিয়ামে বেশি দিন স্থায়ী হয়নি তার চাকরি। বিড়লা মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও অশোকের খিটিখিটি শুরু হয়ে গেল— অবশেষে বিড়লা মিউজিয়ামের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সে স্টেট ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে চাকরি নিল— সেখানেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বহাল ছিল— তবে ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা বজায় ছিল নিরন্তর। বিড়লা মিউজিয়াম চাকরি করাকালীন অশোক একদিন আমার কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এলো। সে একটা বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করতে চায়। আমাকে সঙ্গে চায়। পত্রিকার বিষয় হবে বিজ্ঞান পত্রিকা, যুক্তিবাদ ও সমাজ। ভাষা হবে সহজ, সরল। পাঠক হবে সমাজের সাধারণ স্তরের

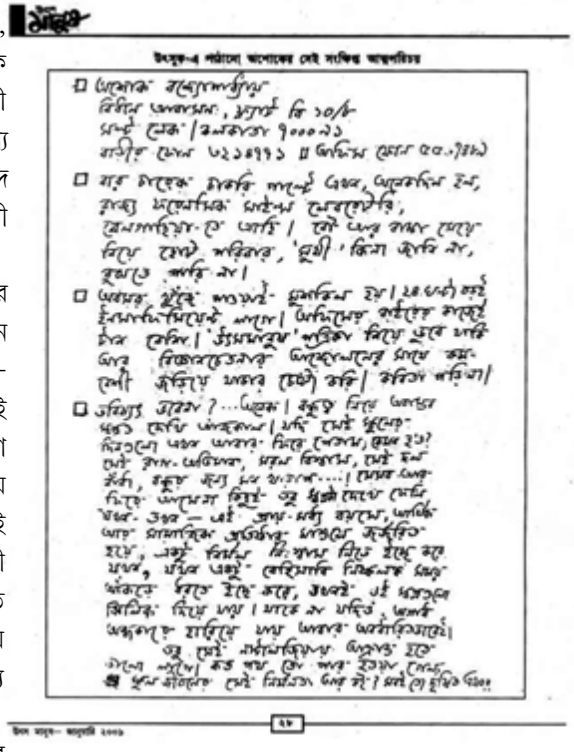

মানুষ। যারা ইচ্ছে করলে সমাজের দীনতা, অন্ধতা, কুসংস্কারের অচলায়তনকে ভেঙ্গে দিতে পারবে। নামও ঠিক করে নিয়ে এসেছিল। পত্রিকার নাম হবে 'মানুষ'। আর পাঁচটা ভাল কাজের সঙ্গে যেমন জুড়েছিলাম, জুড়ে গেলাম অশোকের সঙ্গে। 'মানুষ'-এর সঙ্গে। কাঁধে কাঁধ দিয়ে লেগে পড়লাম পত্রিকা প্রকাশনার কাজে। অশোক জড়ো করল প্রদীপ দত্ত ('পকাই' নয়) নামে এক সহকর্মী বন্ধুকে। আমি, অশোক ও প্রদীপ। পত্রিকার প্রচ্ছদ এঁকে দিল আমারই সহকর্মী বন্ধু সমীর মণ্ডল। আজ সমীর বিশাল মাপের শিল্পী। থাকে মুম্বাইতে। অন্যান্য বন্ধুদের আর্থিক অনুদান, জি পি এফ থেকে টাকা ধার করে একটা ফান্ড গড়া হলো। নিবারণ সাহা আমাদের আর এক সহকর্মী। বৈঠকখানার কার্তিক বসু স্ট্রীটে তার একটা বাঁধাই কারখানা ছিল। নিবারণ সাহাকে সঙ্গে নিলাম। তার বাঁধাই কারখানায় সপ্তাহে দু'একদিন বসার ব্যবস্থা করে দিল। বই বাঁধাইয়ের দায়িত্ব নিল। এঁদের সাহায্য না পেলে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানুষ' পত্রিকা গড়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেতো। এইভাবে পরোক্ষভাবে 'মানুষ' পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকলো বিড়লা মিউজিয়াম। হয়তো অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আকাশবাণী ছেড়ে বিড়লা মিউজিয়ামে না আসলে 'মানুষ' পত্রিকা, পরবর্তীকালে 'উৎস মানুষ' পত্রিকা, প্রকাশিত হতো কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

এখন মনে হয় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি 'উৎস মানুষ' না করে বিজ্ঞান লিখিয়ে হতো তাতেও সমানভাবে নাম করতে পারতো। অশোকের লেখার ধার ছিল বেশ জোড়ালো, শব্দ চয়ন ছিল ততোধিক বলিষ্ঠ। অশোক মার্টিন গার্ডনারের Fads and Fallacies in the name of Science এবং Science : Good, Bad and Bogus বাংলা অনুবাদ করে 'বিজ্ঞানকে মুখোশ করে' এই নামে। মার্টিনের বঙ্গানুবাদ পড়ে কখনো মনে হয়নি এটি একটি অনুবাদগ্রন্থ। বইটা পড়তে পড়তে কখনো হোঁচট খেতে হয় না।

অশোক যে বিষয়টা ধরত তার শেষ দেখে ছাড়ত। সর্পবিশারদ শ্রী অবনীভূষণ ঘোষের সঙ্গে আলাপের সূত্রে সাপ সম্পর্কে অশোকের বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয়। সাপ নিয়ে অশোক পড়াশুনা শুরু করে দেয়। পত্রিকার পাতায় 'সাপ নিয়ে কিংবদন্তী' কলমে ধারাবাহিক লেখা শুরু করে। সেই পত্রিকার পাতায় সেই লেখাগুলো পড়ে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরা সাপ সম্বন্ধে কুসংস্কার, অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা নিয়ে প্রচারে নেমে পড়ে। সরকারকে বাধ্য করে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুফল সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে। অশোকের সাপের ওপর লেখা পড়ে ক্যানিং যুক্তিবাদী ও সাংস্কৃতিক সংস্থা সাপ নিয়ে হাতে কলমে কাজ শুরু করে দেয়। সাপে কাটা মানুষের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, কুসংস্কার ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার অভাব অশোককে তাড়িত করত। তাই মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যানিং যুক্তিবাদী ও সাংস্কৃতিক সংস্থার একজন অভিভাবক, বন্ধু, সাথী হিসাবে যুক্ত ছিল।

অশোক 'উৎস-মানুষ'কে আপনস্নেহে লালন প্রতিপালন করত। উৎসমানুষকে নিজের থেকে কখনো আলাদা ভাবতে পারত না। তার এই অতি ভালবাসা কখনো কখনো পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি, প্রচার, প্রসারে বাধা সৃষ্টি করেছে। যখনই তার মনে হয়েছে পত্রিকা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বা কোন কর্মী-বন্ধুর সংযোজনে পত্রিকা গতি পাচ্ছে, অন্য মাত্রা পাচ্ছে— তখনই অশোকের মনে হতো উৎস মানুষ তার হাতছাড়া হচ্ছে— এটা একদম মেনে নিতে পারতো না। এর ফলে বহু দক্ষ লেখকবন্ধু, সংগঠক বেশি দিন একসঙ্গে চলতে পারে নি— সংঘাত বেঁধেছে ব্যক্তিত্বে। তবে যে বন্ধুরা উৎস মানুষ ছেড়ে চলে গেছেন তাঁরা এতটাই মহান যে তাঁরা কখনোই উৎস মানুষের ক্ষতি চান নি। তাঁরা সব সময় চেয়েছিলেন উৎস মানুষ বেঁচে থাকুক নিজের মতো করে।

অশোকের একটা উক্তি এখনো আমাকে ভাবায়। সেই প্রসঙ্গে আসছি। উৎসমানুষ দীর্ঘ চলার পথে বহু সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। আর্থিক সংকট এবং ব্যক্তিত্বের সংঘাত। এমনি কোন একটা সংকটের মুহূর্তে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছিল— 'আমি যদি উৎস মানুষে না থাকি তবে 'উৎস মানুষ' বন্ধ করে দেবো'।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই উক্তি আমাকে খুব ভাবিয়েছিলো— সেই দিন।

লেখক পরিচিতি: পবন মুখোপাধ্যায় গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী, উৎসমানুষ পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে দীর্ঘ দিন সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক।

‘মিতানিন’-এর মায়াকল্প

নতুন রাজ্য ছত্তিশগড়ের ‘মিতানিন’ প্রকল্পটি নানা কারণে দেশ জুড়ে আলোচনার বিষয়। ছত্তিশগড়ী ভাষায় মিতান শব্দের অর্থ বন্ধু, মিতানিন বান্ধবী। মিতানিন প্রকল্পের ধারণাটি যাঁরা প্রথম গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের কাছে এটি ছিল জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি ধাপ। জনগোষ্ঠীর নারীরা স্বাস্থ্যকর্মী হয়ে সেই স্বাস্থ্য-অধিকারের দাবি গড়ে তুলবে এটাই ছিল তাঁদের বিচারে এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

রাজ্য সরকারের হাতে পড়ে প্রকল্পটি খাতায় কলমে বাস্তবায়িত হল বটে, কিন্তু ‘মিতানিন’ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হবার বদলে কম মাইনের নিম্নতম স্তরের সরকারি কর্মচারী হয়ে উঠল — যার ন্যুব্জ পিঠের ওপর আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিছু কাজ করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়। সরকারী আমলারাজের হাত থেকে ক্ষমতা জনগণের কাছে হস্তান্তরিত না হবার ফলে সমাজ-সচেতক কর্মীর ভূমিকা কিভাবে প্রশাসনের ক্ষুদ্র ক্রীড়নকের ভূমিকায় পরিণত হয় তার বিবরণ দিয়েছেন **ডা. বিনায়ক সেন**।

২০০২ সালের মধ্যভাগ থেকে নবগঠিত ছত্তিশগড় রাজ্যব্যাপী সরকারী স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবস্থায় সংস্কার ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার যেন জোয়ার এসেছে। এই প্রকল্পটি পরিকল্পিত হয়েছে দুটি বৃহৎ শিরোনামে : একটি হল, ‘মিতানিন’ নামক জনগোষ্ঠীজাত স্বাস্থ্যকর্মিনী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও সক্রিয়করণের দ্বারা ‘স্বাস্থ্য-পরিষেবার অধিকার’ শীর্ষক বার্তাটির বোধগম্যতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন, অপর বৃহত্তর বিভাগটি হল রাজ্যের স্বাস্থ্য-পরিষেবা পরিকাঠামোর আমূল পরিবর্তনের একগুচ্ছ কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করা। পরিকাঠামো বিকাশের আশাব্যঞ্জক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নির্মাণকাঠামোর সমস্যার জন্য যে ভাবে সমগ্র প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে তাতে এটির অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক সত্যটি অধরাই থেকে গেছে। এই বিশিষ্ট প্রকল্পটি বিশদ করে দেখিয়ে দেয়, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্যোগের অভাব, কিভাবে রাজ্যস্তরের স্বাস্থ্য-পরিষেবার কর্মসূচীর উপর প্রকল্পনির্মাণ কাঠামোর অনুশাসন বলবৎ করে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি নবগঠিত রাজ্যের একটি হল ছত্তিশগড়। ২০০০ সালের ১লা নভেম্বর এর জন্ম। এই রাজ্যে লিঙ্গ অনুপাত ছাড়াও স্বাস্থ্যের উপর প্রভাবসৃষ্টিকারী সব সূচকই স্বাস্থ্যব্যবস্থার পক্ষে অনুপযোগী। সাম্প্রতিক কালে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ছত্তিশগড়ের পি ইউ সি এল পরিচালিত এক সমীক্ষায় আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম। এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :

ক) আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশেরই লক্ষ্যিত (targeted) গণবন্টন ব্যবস্থার আওতায় আসবার ন্যূনতম ক্রয়ক্ষমতাটুকুও নেই।

খ) এই জনগোষ্ঠীর বহুলাংশের কাছেই পরিশ্রুত পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা পৌঁছয়নি।

গ) সরকারী স্বাস্থ্য-পরিষেবা এই জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছতে সক্ষম হয় নি।

ঘ) দেহভর সূচক (বি এম আই) নির্ণয় করে দেখা গেছে যে এই গোষ্ঠীর গড় দেহভর সূচক ১৮.৫ শতাংশের নীচে।

সমগ্র বিষয়টির মধ্যে এই নিবন্ধে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিশ্লেষণের দিকে।

ছত্তিশগড় সরকার ২০০২ সালের জানুয়ারী মাসে নানাবিধ আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করেন যেগুলির উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবস্থার নির্দিষ্ট পরিবর্তনের লক্ষ্যে সামগ্রিক কর্মসূচী গ্রহণ। এটা স্থির হয় যে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের আর্থিক সহায়তা আসবে ইউরোপিয়ান কমিশনের ‘ক্ষেত্র পূনর্গঠন প্রকল্প’ (sector reform program)-এর কাছ থেকে। রাজ্যের স্বাস্থ্য-পরিষেবা দফ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ছাড়াও উচ্চপদস্থ আমলা, সুশীল-সমাজের নেতৃবৃন্দ ও স্বাস্থ্য-আন্দোলনকারীরাও এই বিস্তৃত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সব আলোচনার ফলস্বরূপ দুটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় :

প্রথমটি হল : রাজ্যজুড়ে জনস্বাস্থ্যকর্মিনী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের উদ্যোগ।

দ্বিতীয়টি হল : রাজ্যের স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য ১৫ ধাপের কর্মসূচী গ্রহণের পরিকল্পনা। আমরা এই দুটি বিষয় একটু বিশদে আলোচনা করব।

জনস্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্প

আগেই বলেছি এই প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্যকর্মিনী নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই কর্মীদের নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক যেমন—

ক) সকল কর্মীই হবেন নারী। তাঁদের বলা হবে ‘মিতানিন’। নামটি এক সাংস্কৃতিক উজ্জ্বল সম্পর্কের নির্দেশ করে যার ফলে নানান বিরুদ্ধ মতামত জন্ম নেয় — শেষপর্যন্ত অবশ্য এক সমঝোতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

খ) যে গোষ্ঠীকে তাঁরা পরিষেবা প্রদান করবেন সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ভিতর থেকেই এই কর্মীদের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন করতে হবে।

গ) আলোচ্য গোষ্ঠীগুলি হবে ছোট ছোট নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক, পুরো গ্রাম জুড়ে নয়। সহজ কথায় এই গোষ্ঠী হল কয়েকটি পরিবার যাঁরা নিজেরাই নিজেদের একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন ও নিজেরাই নিজেদের স্বাস্থ্যকর্মী নির্বাচনের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছেন। ‘পেসা’ (PESA) তে ‘গ্রাম সভা’ বলে যে ধারণা

নির্দিষ্ট করা আছে তারই ভাবধারায় এই গোষ্ঠী নির্বাচনের প্রয়াস।

ঘ) শিক্ষাগত উৎকর্ষতা কখনই এই কর্মিনী নির্বাচনের মাপকাঠি হবে না।

ঙ) কোনো 'মিতানিন' তাঁর প্রদত্ত পরিষেবার জন্য সরকারের কাছ থেকে কোনো বেতন বা ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্ত এক দীর্ঘ মতান্তরের সৃষ্টি করেছিল কিন্তু সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে 'মিতানিন' হবেন গোষ্ঠী-প্রতিনিধি— সরকারী কর্মচারী প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণ বা গোষ্ঠীভিত্তিক কর্মসূচী চলাকালীন এঁদের ক্ষতিপূরক ভাতা দেবার কথা অবশ্য এই আলোচনায় স্থান পেয়েছিল।

চ) গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের জন্য এই স্বাস্থ্যকর্মিনীদের হাতে-কলমে কিছু নির্দিষ্ট কাজ শিখতে হবে, যার জন্য তাঁদের কিছু সময় ধরে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাঁদের প্রধান কাজ হবে 'স্বাস্থ্য-পরিষেবার অধিকার-বোধ' জাগিয়ে গোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য-পরিষেবার দাবী সম্বন্ধে সচেতন করা। এজন্য বিশেষ স্লোগান তৈরী হল 'স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার'।

স্বাস্থ্য-ক্ষেত্র পুনর্গঠনের কর্মসূচী

২০০২ সালে জাতীয় স্তরে আলোচনায় চিহ্নিত করা হল স্বাস্থ্য পরিষেবার কিছু কিছু ক্ষেত্রকে, যেখানে রাজ্যের নীতি, নিয়ম, আইন, প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানে গঠনগত পরিবর্তন আবশ্যক। জোর দেওয়া হল মূলতঃ জনস্বাস্থ্য প্রক্রিয়াকে বলিষ্ঠ করার উপর — প্রাথমিক ও জেলাস্তরে স্বাস্থ্য-পরিষেবা, স্বাস্থ্য-সমীক্ষা ও মহামারী নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করে তোলার উপর। এই প্রকল্পের অন্তর্গত পরিবর্তনের রূপরেখাগুলি বিস্তারিত আলোচিত হল।

পরিবর্তন কর্মসূচীতে সুশীল সমাজের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্টকরণ করা হল সহায়ক শক্তি হিসাবে।

১) গোষ্ঠী ভিত্তিক স্বাস্থ্য-পরিষেবা

- ছত্তিশগড় সরকারের মিতানিন প্রকল্পের অন্তর্গত গোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্য-প্রকল্পের চূড়ান্তকরণে সহায়তা।
- 'মানুষের স্বাস্থ্য মানুষের হাতে' — এই সমাজ উদ্দীপক ভাবধারার জনপ্রিয়তা অর্জনে সহায়তা ও সেই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার কার্যকরী দাবী প্রতিষ্ঠা।
- প্রকল্পটির গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রচার প্রক্রিয়া এবং প্যাকেজের রূপরেখা নির্ধারণে সহায়তা।
- 'মিতানিন' প্রকল্পের বিস্তারিত কর্মপ্রণালী প্রণয়ন ও তা কার্যকরী করার রূপকল্প প্রস্তুতিতে সহায়তা।
- 'মিতানিন' প্রকল্পের সকল প্রকার প্রশিক্ষণের ছক ও শিক্ষণব্যবস্থা প্রস্তুতিতে সহায়তা।
- প্রকল্পের মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা।
- প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপক ও হিসাব রক্ষকদের নিজ নিজ ভূমিকা অর্জনে সহায়তা।

২) প্রতিনিধিত্ব ও আংশিক স্বায়ত্ত্বশাসন

- ছত্তিশগড় সরকারকে নিম্নলিখিত স্বয়ংশাসিত প্যাকেজ তৈরীতে সাহায্য করা —
  - ক) সংযুক্ত (integrated) জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংস্থা
  - খ) হাসপাতাল
  - গ) জেলা ও সহায়তা স্তরে প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ম্যানেজার) নিয়োগ
  - ঘ) পি আর আই (PRI) ও ইউ এল বি এস (ULBS)
- আর্থিক ক্ষমতা ও অন্যান্য সম্পদের হস্তান্তর বা পাত্রান্তরের পরিকল্পনা, মূলতঃ পি আর আই ও ইউ এল বি এস-কে আর্থিক অনুদান।
- স্বচ্ছতার প্রক্রিয়া, তথ্যের অধিকার ও সামাজিক ব্যয়ের হিসাব প্রক্রিয়াকে বলিষ্ঠ করা।

৩) স্বাস্থ্যজ্ঞান, নজরদারী (surveillence), মহামারীবিদ্যা (epidemiology) ও পরিকল্পনা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করা

- বর্তমান স্বাস্থ্যজ্ঞান ও নজরদারী প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন করে 'মিতানিন' প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সংস্কার সংযোজিত করা।
- গ্রাম ও জেলার স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় আঞ্চলিক জনগণের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া চালু করা।
- পরিসংখ্যান ব্যবস্থার মান, নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধন।

৪) মহামারী নিয়ন্ত্রণ

মহামারী প্রতিরোধ, আগাম রোগ-নির্ণয়, আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মহামারীজনিত মৃত্যু ও শারীরিক অক্ষমতার আশু প্রতিরোধের জন্য জনস্বাস্থ্য-পরিষেবা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পরিষেবার উন্নতি সাধনকল্পে সহায়তাদান।

৫) দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য সমস্যা

- গ্রাম ও শহরের দরিদ্র মানুষের মুখ্য স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি নির্ণয়ের জন্য পারস্পরিক অংশগ্রহণলব্ধ সমীক্ষা।
- পাড়া, জেলা ও রাজ্যস্তরে পারস্পরিক আলোচনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা।

৬) ক্ষমতা অর্জন

- জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ও হাসপাতাল ম্যানেজারদের নতুন ভূমিকা যথাযথ পালনের জন্য ক্ষমতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় ও প্রশিক্ষণ প্যাকেজ নির্মাণে সহায়তা।
- গ্রামসভা থেকে শুরু করে ইউ এল বি এস পর্যন্ত জনসংযোগকারী ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতা অর্জনের প্রশিক্ষণ প্যাকেজ নির্মাণে সহায়তা।
- বর্তমান অর্থ তহবিলকে যথোপযুক্ত ব্যবহার, বাজেট নির্মাণ ও পরিকল্পনা রূপায়নের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা।
- আঞ্চলিক স্বাস্থ্য দফ্তরের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়বদ্ধ সামাজিক প্রক্রিয়া রূপায়ন যেমন সামাজিক আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ ইত্যাদি।

৭) ওষুধ ব্যবহারের যুক্তিগ্রাহ্য নীতি

- রাজ্যের জন্য সঠিক ওষুধ ব্যবহার নীতি প্রণয়ন।
- সেই নীতির যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতন থাকা।
- সঠিক ওষুধ ব্যবহার নীতি প্রচলনের পর তার সামাজিক নজরদারীর স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নির্মাণ।

৮) জনস্বাস্থ্য দফ্তরের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার মানোন্নয়ন

- পরিবর্তনযোগ্য আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চিহ্নিতকরণ।
- সেই প্রক্রিয়াগুলির প্রয়োজনীয় রদ্‌বদলের পরিকল্পনা।

৯) কর্মী পরিচালনা ও বদলীর নীতি

স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত কর্মী পরিচালনা নীতি প্রণয়নে সহায়তা।

১০) ওষুধ বিতরণ ও হিসাবরক্ষণ

- ওষুধ জোগান ও বিতরণের প্রতিবন্ধের স্থানটি চিহ্নিতকরণে সহায়তা।
- রাজ্যব্যাপী সঠিক মূল্যে ওষুধ সরবরাহের জন্য আধা-সরকারী সংস্থা স্থাপনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।
- রাজ্যে ওষুধ বিতরণের পরিসর আরও বিস্তারের জন্য পরামর্শভিত্তিক নীতি নির্ধারণ।
- নতুন ওষুধ বিতরণের প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার নিয়ন্ত্রণ।

১১) চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈষম্যহীন প্রক্রিয়া

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরে সমমানের চিকিৎসা গ্রহণের সুপারিশ।

১২) তথ্য প্রক্রিয়া পরিচালনা

জেলাস্তর পর্যন্ত 'মিতানিন' সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের জন্য ছত্তিশগড় সরকারকে সহায়তা।

- এম আই এস থেকে শুরু করে সকল স্তরে গ্রাহক সুবিধা বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য ফলাফলের বিষয় অবহিত থাকার জন্য ছত্তিশগড় সরকারকে সহায়তা।
- উপরোক্ত বিভাগের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ছত্তিশগড় সরকারকে সহায়তা।
- স্বাস্থ্য দফ্তরের আভ্যন্তরীণ সকল স্তরে 'হার্ডওয়্যার' ও 'সফ্টওয়্যার'-এর সুযোগ সৃষ্টির জন্য ছত্তিশগড় সরকারকে সহায়তা।
- ছত্তিশগড় সরকারকে কমপক্ষে দুটি 'ওয়েবসাইট্' নিমাণে সহায়তা— একটি 'মিতানিন' প্রকল্পের জন্য, অন্যটি স্বাস্থ্য দফ্তরের জন্য।

১৩) ল্যাবোরেটারি পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণ

- সস্তায় রোগনির্ণয়ের যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়া নির্মাণ করে প্রাথমিক স্তরে ল্যাবোরেটারি পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণে সহায়তা।
- খালিপদ ল্যাব-সহায়কদের জন্য রাজ্যজুড়ে প্রশিক্ষণ প্যাকেজ নির্মাণে সহায়তা।

১৪) ভারতীয় ওষুধ পদ্ধতি, বিশেষত: দেশজ / ভূমিজ-ওষুধকে মূলধারায় আনবার প্রয়াস

ছত্তিশগড়ে জনজাতিগুলির প্রচলিত ওষুধ ব্যবহার পদ্ধতিকে মূলধারায় সংযোজনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।

১৫) ম্যালেরিয়ার ওষুধের নিষ্ক্রিয়তা

- ছত্তিশগড়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্লোরোকুইন নিষ্ক্রিয়তা (resistance)-এর মাত্রা খতিয়ে দেখা।
- ছত্তিশগড়ের জঙ্গলপরিসীমা এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ও সম্ভাবনার উপর আলোকপাত ও ম্যালেরিয়ার সম্পূর্ণ নিরাময়ের নির্দেশাবলী।

রাজ্য উপদেষ্টা কমিটি গঠন

এই পরামর্শগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে ছত্তিশগড় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফ্তর রাজ্যের মুখ্য বেসরকারী সংস্থাগুলির সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে সহযোগিতা করবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই এন জি ও-গুলি রাজ্যের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মে সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। এঁরা হলেন— 'রূপান্তর', 'জন স্বাস্থ্য সহযোগ', 'জেলা সাক্ষরতা সমিতি' (দুর্গ), 'ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সমিতি', 'রায়গড় ও অম্বিকাপুর স্বাস্থ্য সোসাইটি' ও 'রামকৃষ্ণ মিশন'। সরকারের আদেশ অনুসারে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্য উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠিত হয়। এই সকল এন জি ও-গুলির প্রতিনিধিগণ, উর্দ্ধতন রাজ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও আর্থিক সহায়তাদায়ী সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে, যাঁরা স্বাস্থ্যখাতে অনুদান দিয়েছিলেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অগ্রগতির

নজরদারী ও জনস্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্পে প্রয়োজনীয় তথ্যনির্দেশ প্রদান।

রাজ্য স্বাস্থ্য-সম্পদ কেন্দ্র

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও গোষ্ঠী-স্বাস্থ্যকর্মিনী তৈরী করবার বিশাল কর্মকাণ্ডে নিয়ত সহায়তা দেবার জন্য Action Aid-কে অনুরোধ করা হয়েছিল। উদ্দেশ ছিল একটি রাজ্য সম্পদ কেন্দ্র (SHRC) গড়ে তোলা, যেটি ছত্তিশগড় সরকারের তরফ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবে, যাতে ছত্তিশগড়ের স্বাস্থ্য পরিষেবা উচ্চমানের মানবসম্পদ আহরণ করতে সক্ষম হয়। এই রাজ্য স্বাস্থ্য-সম্পদ কেন্দ্রের নিয়মাবলীর ঐক্যমত্য ও দৃঢ়বদ্ধতা ঘটল স্বাস্থ্য সচিব ও Action Aid-এর প্রধান পরিচালকের মধ্যে সম্মতিপত্র (MOU) সাক্ষরের মাধ্যমে।

এই MOU অনুযায়ী রাজ্য স্বাস্থ্য সম্পদ কেন্দ্রের সংজ্ঞা হল — ''স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত কারিগরী ক্ষমতা যা পরিবর্তন কর্মসূচীর নকশা তৈরী করে সাম্প্রতিক সময়ের স্বাস্থ্য-পরিষেবাকে গোষ্ঠীভিত্তিক স্বাস্থ্য-পরিষেবায় রূপান্তরিত করবে, পুনর্গঠন কর্মসূচীর কার্যকারিতার জন্য উপযুক্ত পথনির্দেশ করবে, জেলা স্বাস্থ্য দফ্তর ও অন্যান্য প্রকল্প-ব্যবস্থাপককে ক্রমাগত কারিগরি সহায়তা দিয়ে যাবে যাতে এই পুনর্গঠন কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।''

উপরোক্ত প্রকল্প তার মুখ্য লক্ষ্যমাত্রা থেকে কতটা দূরে সরে এসেছে সে বিষয় বিশ্লেষণ করার আগেই এই প্রকল্পের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সাফল্যের পরিমাপ করব।

প্রকল্পটির সাফল্য

এ পর্যন্ত ৫০,০০০ 'মিতানিন' নির্বাচিত হয়েছেন ও তাঁদের প্রশিক্ষণ চলছে। রাজ্যজুড়ে নানান প্রশিক্ষণ প্রকল্পে তাঁরা যোগ দিচ্ছেন। তাঁদের অনেকেই যোগ দিচ্ছেন গ্রামস্তরে পরিবার-স্বাস্থ্য-সমীক্ষায়। সহায়ক সেবিকা-ধাত্রী ও ঐ জাতীয় কর্মীদের কিছু কাজকর্মের নজরদারীর জন্য মিতানিনদের সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার। তাঁদের অনেককেই দেওয়া হয়েছে ওষুধের বাক্স, কিন্তু তাঁদের এই বাক্স ব্যবহারের ফলাফল এ পর্যন্ত আমাদের গোচরে আসেনি।

মিতানিনদের দেওয়া হয়েছে রোগী 'রেফার' করার স্লিপ যাতে তাঁরা রোগীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে পাঠাতে পারে। অত্যন্ত জরুরী ওষুধের একটি চূড়ান্ত তালিকা তৈরী করা হয়েছে। চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এই ওষুধগুলি ব্যবহারের প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা বিষয়ে। নির্ভরযোগ্য মানের ওষুধ ক্রয়, ভাণ্ডার নির্মাণ ও বণ্টনের এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়েছে ও তা ধীরে ধীরে প্রয়োগ করা হচ্ছে এক গুচ্ছ নির্দিষ্ট মানের চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এবং মিতানিনদের কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মীসংখ্যা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা করা হয়েছে ও সেই অনুযায়ী তা প্রয়োগ করার কথা ভাবা হচ্ছে। রাজ্য মানব-সম্পদ কেন্দ্র একগুচ্ছ পুস্তিকা প্রকাশ করেছে তাদের নিজস্ব তথ্যভাণ্ডার ও বহিরাগত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহায়তা নিয়ে। এগুলির মধ্যে

রয়েছে ৬টি 'মিতানিন-প্রশিক্ষণ' পুস্তিকা, 'মিতানিন' প্রকল্পের আদর্শ ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধীয় পুস্তিকাও ছাপা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ছত্তিশগড় রাজ্য ঔষধ তালিকা, চিকিৎসক ও পার্শ্ব চিকিৎসকদের চিকিৎসাসংক্রান্ত আলাদা আলাদা নির্দেশাবলী, কর্মী সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় মানবসম্পদের স্থান সম্বন্ধীয় পুস্তিকা। ম্যালেরিয়া চিকিৎসা ও গবেষণা শিবিরের ক্রিয়া প্রক্রিয়া, উচ্চমানের প্রাথমিক স্বাস্থ্য-পরিষেবা (EQIP - enhanced quality of primary health) প্রকল্পটিও রাজ্য মানবসম্পদ কেন্দ্র গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল পরিষেবা-বণ্টন ব্যবস্থার মান ও কার্যকারিতাকে উন্নত করা।

ছত্তিশগড় সরকার ৩২টি ব্লকে স্বাস্থ্য-পরিষেবা জোরদার করতে উদ্যোগ নিয়েছে যাতে করে আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে তা সমস্ত ১৪৬টি ব্লকে বিস্তৃত করা যায়।

আলোচনার পর, পারস্পরিক মতানুযায়ী লক্ষ্য স্থির করার সিদ্ধান্ত নাকচ করে জোর দেওয়া হল মাতৃ-মৃত্যুহার হ্রাস করার দিকে। এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে,

ক) জনগোষ্ঠী চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিকে ২৪ ঘন্টা প্রসবকালীন পরিষেবা দানের ক্ষমতাসম্পন্ন করে,

খ) প্রতিটি আঞ্চলিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা প্রসবের বন্দোবস্ত নিশ্চিত করে, ও

গ) নিম্নস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিষেবাকে উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন করে।

যুক্তি দেওয়া হল যে, পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, জনবল, ক্ষমতা ইত্যাদি মধ্যেকার ফাঁক ভরাট করতে পারলে উপরোক্ত লক্ষ্য পূরণ সম্ভবপর হবে। এরই সাথে যদি প্রাতিষ্ঠানিক ও উদ্দীপনামূলক প্রক্রিয়া যুক্ত হয় তাহলে শুধু প্রসবই নয় সেই ব্লকে সমগ্র গণপরিষেবা বণ্টনব্যবস্থা উন্নতিলাভ করবে। সমান্তরালভাবে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার স্থল চিহ্নিতকরণের কাজ চালাতে হবে - যেমন সুবিধাদানের উপযুক্ত স্থান, কার্যকরী রোগী রেফার করার ব্যবস্থা, মিতানিন প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ ও কর্মীদের নানামুখী প্রশিক্ষণ ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

এই প্রকল্পের ফলে যাদের স্বার্থ, বিঘ্নিত হয়েছে সেই নানাবিধ শক্তিশালী স্বার্থের (vested interests) সঙ্গে সংঘাত সত্ত্বেও অনেক কাজই সফল হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখাতে চলেছি যে এই সব পরিবর্তন সত্ত্বেও সমানাধিকার সম্পন্ন (equitable) সহজলভ্য, কার্যকরী ও মানবিক স্বাস্থ্য-পরিষেবা পদ্ধতি প্রবর্তনের সম্ভাবনা আদতে অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে এই রকম ফলাফলের জন্য দায়ী নানান কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এদের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল :

- জনস্বাস্থ্য প্রকল্পের রাজনৈতিক চরিত্রের সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্তি।
- ছত্তিশগড়ে পূর্ব-বিরাজমান বিশাল এক বেসরকারী স্বাস্থ্য-পরিষেবার বাতাবরণ।
- এই প্রকল্পের অন্তর্গত মূলভাবনা : প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহায়তা হস্তান্তর / পাত্রান্তরের জন্য সচেষ্ট হবার ব্যর্থতা।

চুলচেরা বিশ্লেষণে আসছি এরপর। কয়েকটি নমুনা ও তার বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখ আলোচনায় উঠে আসবে প্রকৃত দিশাহীনতা, যা এই প্রকল্পকে ধুলিস্যাৎ করেছে।

চুলচেরা মূল্যায়ণ

আদতে এই প্রকল্প সূত্রায়িত করবার সময় বলা হয়েছিল যে স্বাস্থ্যকর্মিনীরা তাঁদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে 'স্বাস্থ্যের অধিকার' সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করবেন। সেই সংক্রান্ত স্লোগানের অর্থও বোঝাবেন। রাজ্যে অনুদানপুষ্ট প্রক্রিয়ায় এ ধরনের দাবী প্রতিষ্ঠা সম্ভব— এই ভাবনা আমাদের অতিশয় সারল্যপ্রসূত ভাবলে ভুল হবে। প্রকল্পের প্রাথমিক আলোচনার সময় রাজ্যের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর যাঁরা, সেই সুশীল সমাজের সহযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যাঁরা ছত্তিশগড় বা অন্যত্র নানান উপায়ে মানুষকে স্বাস্থ্যের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন এঁদের মধ্যে আছেন— শহীদ হাসপাতাল যাঁরা ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার পটভূমিকায় রোগনিরাময়ের উপায় উদ্ভাবনের উল্লেখযোগ্য পথিকৃত। রয়েছেন 'রূপান্তর' যাঁরা শহীদ হাসপাতালের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, জনজাতির ভূমি আন্দোলনের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন এবং জনস্বাস্থ্য কর্মী-নির্ভর স্বাস্থ্যপ্রকল্পের অভিজ্ঞানও অর্জন করেছিলেন। রায়গড় অম্বিকাপুর স্বাস্থ্য-সমিতি জনস্বাস্থ্যবীমা ও তার বিলি ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করেছিলেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে। CEHAT হল সেই সংস্থা যাঁরা মহারাষ্ট্রে স্বাস্থ্য-পরামর্শদাতা ও স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণের কাজ করেছিলেন। BGVS এর অভিজ্ঞতা ছিল সামাজিক উদ্দীপনা জাগরণের। এঁরা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সংযুক্তিকরণ ও নানা জনহিতকর বিষয়ের দাবী তোলেন। অংশগ্রহণকারী সকল সুশীল সমাজ সংস্থাগুলি এই মর্মে নিশ্চিত আশ্বাস পেয়েছিলেন যে এক বছর অগ্রণী কর্মসূচী (pilot project)-এর মধ্যে তাঁরা জনস্বাস্থ্যকর্মীসম্বন্ধীয় এই নতুন ভাবনাকে কার্যকরী করে তোলার সুযোগ পাবেন, যে কাজ হবে তা সরকারী হস্তক্ষেপমুক্ত হবে এবং এই এক বছরের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ছত্তিশগড় জুড়ে জনস্বাস্থ্যকর্মী ভাবনাকে পরিপুষ্ট করে তুলবে। SAC গঠন করে এই প্রকল্পে সুশীল সমাজের অংশীদারিত্ব আনুষ্ঠানিক করবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কার্যত মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে SAC শীঘ্রই কোণঠাসা হয়ে গেল এবং বাস্তবে দেখা গেল যে বিগত ১২ মাসের মধ্যে SAC-র একটিও সভা সংগঠিত হয় নি। অর্থাৎ গোড়াতেই ঘটল আশ্বাসভঙ্গ। রাজ্য স্বাস্থ্য সম্পদ কেন্দ্র (SHRC) নিয়মমাফিক গড়ে উঠল। প্রকল্পের কাজ পুরোদমে শুরু হলেও ফলাফল-সূচক নির্ণয়ের ভার পড়ল এক সংস্থার হাতে যাঁরা নিজেদের সরকার অনুগামী সংস্থা মনে করেন। উপরন্তু সরকারের অন্দরে ও বাহিরে ক্ষমতাশালীরা অচিরেই বুঝে গেলেন যে 'মিতানিন' হল গ্রামের মধ্যে আনকোরা চট্‌জলদী এক পৃষ্ঠপোষকতার উপায়। তাঁরা দ্রুত প্রকল্পের খালি পদগুলি ভর্তি করে ফেললেন ও তড়িঘড়ি প্রকল্পের দায়িত্ব নিলেন। নতুন রাজ্যগঠনের এক বছরের মধ্যেই আচমকাই এক গাদা নতুন এন জি ও-র দেখা পাওয়া গেল, যাঁরা হয়ে উঠলেন এই সকল প্রভাবশালীদের স্বার্থান্বেষী অভিলাষ চরিতার্থের হাতিয়ার। এই আঁতাত খুব চাপ দিতে লাগল প্রকল্পটির বিস্তারের দিকে। প্রকল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্পটি মূল্য উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হল, অধিকারমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে জোর দেওয়া হল কারিগরি পথ নির্দেশিকার উপর। এর ফলে 'স্বাস্থ্যের অধিকার' সম্বন্ধে সচেতনতা জাগানোর সম্ভাবনার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও ধ্বংস হয়ে গেল। এই সরকার অনুগামী সংস্থা শীঘ্রই হয়ে উঠল আংশিক সরকারি সংস্থা। এবং এরাই 'মিতানিন' প্রকল্পের মূল ভাবনাকে বিকৃত করে তুলল।

ছত্তিশগড়ের বর্তমান সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো হয়ে উঠেছে বহুলাংশে বেসরকারী উদ্যোগ নির্ভর। সমস্ত বেতনভোগী ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনুমতি দেওয়া

হয়েছে। মুষ্টিমেয় বিরল কয়েকজন ছাড়া কাজের দিনের অধিকাংশ সময় তাঁরা ব্যয় করছেন এই প্রাইভেট প্র্যাকটিসে। তাছাড়া, অর্থের বিনিময়ে পরিষেবা প্রদানের সাথে সাথে সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি সর্বত্র হয়ে উঠেছে এমনই স্থান, যেখানে কার্যকরী চিকিৎসা পাওয়া যাবে তখনই যখন অর্থের হস্তান্তর হবে। বি পি এল কার্ডধারীরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবার যোগ্য, কিন্তু যে রাজ্যে ৪০ শতাংশ মানুষ অপুষ্টির শিকার সেখানে বি পি এল কার্ড আছে মাত্র ২৫ শতাংশ মানুষের, বিশ্বব্যাঙ্কের সম্মতিক্রমে। তাছাড়া যে পরিস্থিতিতে অধিকাংশ মানুষই অর্থ ব্যয় করছেন সেখানে বিনামূল্যের পরিষেবা হয় নিম্নমানের, এই জাতীয় রীতিনীতিই সক্রিয়ভাবে কার্যকরী হয়ে আসছে। সাধারণ প্রসবের জন্য সহায়ক সেবিকা ধাত্রীরা (এ এন এম) ৫০০ টাকা নিয়ে থাকেন। বহুমুখী স্বাস্থ্যকর্মীরা (এম পি এইচ ডব্লিউ) ১০০ টাকা নেন ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য কারণে গ্লুকোজ ড্রিপ্ দেবার জন্য।

এই জাতীয় সংস্থায় বেসরকারী বিনিয়োগ, পরিষেবায় নিরপেক্ষতার ও সহজলভ্যতার অভাবই শুধু ঘটাতে পারে। এই যুক্তি বেসরকারী বিনিয়োগকে হ্রাস করবার কোনো অজুহাত বা আবেদন নয়। কিন্তু এই উপলব্ধি প্রাঞ্জল হওয়া দরকার যে যতক্ষণ না এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে না দেওয়া হবে ততক্ষণ এইসব বিচ্ছিন্ন উদ্যোগসমূহ ফলপ্রসূ হবে না। বর্তমান প্রকল্পের ফলাফলসূচকে (parameters) তেমন কোনো প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অথচ তিন বৎসরব্যাপী সমগ্র প্রকল্পের ১৬ কোটি টাকা বাজেটের এ পর্যন্ত খরচ হয়েছে ৮ কোটি টাকা। তুলনাত্মকভাবে রাজ্যে সমগ্র ৪০০ কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে রাজ্য স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ টাকা থেকে ১২ কোটি টাকা এরই মধ্যে বিনিয়োগ হয়ে গেছে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বে এসকর্টস্ হাসপাতালের সঙ্গে। এসকর্টসের পরিষেবা রয়েছে রায়পুর মেডিক্যাল কলেজের একটি অংশে, যে হাসপাতাল পুরোপুরি গড়ে উঠেছে জনগণের টাকায়।

আমরা মনে করি না 'হস্তান্তর' মানে দারিদ্রক্লিষ্ট জনগণের উপর তাদের নিজ নিজ সম্পদ-সৃজনের দায় ভার চাপিয়ে দেওয়া। বরং এর মানে হওয়া উচিত প্রকৃত সম্পদ ও সিদ্ধান্তের গ্রহণের ক্ষমতা ঐ গোষ্ঠী ও তাদের জোটের হাতে অর্পণ করা বা পাত্রান্তর করা। এই প্রক্রিয়ার জন্য আইনসম্মত ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই

ছত্তিশগড়ে আছে, যে রাজ্যের বৃহত্তম অংশে 'পেসা' কাজ করে চলেছে এবং যে স্থানে পি আর আই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায় ১০ বছরের পুরোনো। এই রাজ্যের গঠনগত পরিবর্তন প্রকল্প বহুলাংশে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে, যেখানে প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত আছে কতিপয় জনবিরোধী সরকারী আমলা, উদাসীন চিকিৎসক প্রশাসক এবং একটি রাজ্য সরকার অনুগামী সংস্থার উপর। এই প্রক্রিয়ায় 'পঞ্চায়েতী-রাজ' ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক ফলাফল লক্ষ্য করলে কৌতূহল-উদ্দীপক তথ্য পাওয়া যায়। 'মিতানিন'দের ভূমিকা ও তাঁরা কাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই সম্পর্কীয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে সেই সব তথ্য যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। মূল ভাবনায় 'মিতানিন'-এর ছিল জনপ্রতিনিধির ভূমিকা। তাঁদের অবৈতনিক হবার মূলে যুক্তি ছিল এটাই। পি আর আই (PRI interface with Mitanin)-এর উপর দায়িত্ব ছিল তাঁদের পরিষেবার জন্য স্বীকৃতিমূল্য বা সম্মানদক্ষিণা দেওয়ার। কিন্তু যেই প্রকল্পটি লক্ষ্যমাত্রা-তাড়িত হয়ে উঠল তখনই প্রকল্পের নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হল স্বাস্থ্য দফতর ও রাজ্য-মানবসম্পদ কেন্দ্রের আমলাদের হাতে। কিন্তু ২০০৩-'০৪ এর বাৎসরিক রিপোর্টে নিয়ন্ত্রণ-কাঠামোটি নির্দেশিত করল এক প্রবল নিয়ন্ত্রণ-জলোচ্ছাস প্রক্রিয়াকে, যেখানে মিতানিনের উপরের স্তরের সকল কর্মীকে বিশেষ ভাবে একটি বা দুটি নির্দেশিকা পূরণ করতে বলা হয়। আশা করা গিয়েছিল এর দ্বারা প্রতিটি মিতানিনের প্রতিটি কাজের নজরদারী সম্ভবপর হবে এবং শুধু মাত্র সেইমতো তথ্য পাঠানো সম্ভব হবে যা নিয়ে সেই স্তরে কাজ করা সম্ভব। এটা এও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল যে প্রতিটি দরকারী নির্দেশিকা কেন্দ্রস্তর থেকে ছাপা হয়ে আসবে এবং রাজ্য মানবসম্পদ কেন্দ্র, জেলা কালেক্টর এবং মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিকদের সঙ্গে একযোগে এই প্রক্রিয়া কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে।

ছত্তিশগড়ের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের গঠনগত পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা প্রশ্ন তুলছে দুটি প্রধান উদ্যোগ সম্পর্কে — সরকারী-বেসরকারী জোট ও রাজ্য-সুশীল সমাজ জোট — যারা এই ক্ষেত্র পুনর্গঠনের মূল হোতা। অনেক মহলে ছত্তিশগড়ের উদ্যোগকে সাফল্যের নমুনা হিসাবে ধরা হয়, বিশেষত উপরোক্ত অংশীদারদ্বয়ের কর্মকুশলতার জন্য। কিন্তু আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে একটি ন্যায়সঙ্গত, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও কার্যকারী স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবস্থা গঠনের জন্য জরুরী রাজনৈতিক পূর্বশর্ত এখনও এই পদ্ধতিতে অনুপস্থিত। 'স্বাস্থ্যের অধিকার' শীর্ষক সামগ্রিক জনচেতনা শুধু একটি অলীক স্বপ্নই নয়, আদর্শ স্বাস্থ্য পরিষেবার গঠনগত পরিবর্তনের জন্য তা একান্তই আবশ্যক। বর্তমানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তাতে জনস্বাস্থ্যকর্মীদের মুক্তিদাতার সচেতন ভূমিকা এখনও অলীক রয়ে গেছে — এটাই হল "মিতানিনের মায়াকল্প"।

লেখক পরিচিতি : ডা. বিনায়ক সেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও মানবাধিকার কর্মী। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতা করায় ছত্তিশগড় সরকারের সাজানো মিথ্যা মামলায় রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে এখন জামিনে মুক্ত রয়েছেন।

অনুবাদক পরিচিতি : ডা. ইলা লাহিড়ী ও ডা. জয়ন্ত লাহিড়ী পেশায় চিকিৎসক। প্রবন্ধকার ও অনুবাদক হিসেবে তাঁদের নাম সুপরিচিত। উল্লেখযোগ্য অনুবাদকর্মের মধ্যে দুটি হল 'গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও আমার জীবন' (লেখক মহম্মদ ইউনুস, প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স) ও 'উন্নয়নের উৎস সন্ধানে' (বাউলমন প্রকাশন)।

With Best Wishes from

A
Well
Wisher

দেখতে দেখতে নতুন সরকারের ন'মাস বয়স হয়ে গেল। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের হাল নিয়ে উদ্বিগ্ন আমজনতা, উদ্বিগ্ন 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-ও। তাই দু-চারজন ওয়াকিবহাল মানুষের কাছে আহ্বান রেখেছিলাম তাঁদের মতামত জানাতে। মত জানিয়ে লিখেছেন অমিতাভ চক্রবর্তী ও আশুতোষ বিশ্বাস। আমরা তাঁদের কথাগুলি পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি। তবে এটা একান্তই তাঁদের ব্যক্তিগত মত, 'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' পত্রিকার এতে কোনও অংশীদারী নেই।

আশা রাখি পেয়ে যাব বাকি দু-আনা

আশুতোষ বিশ্বাস

টাকুরিয়ার আমরি হাসপাতালের ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পরে মানুষ মর্মে মর্মে বুঝেছেন এ রাজ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের কি ভয়ানক হাল হয়েছে। তাঁরা এটাও বুঝেছেন যে নতুন সরকারের ছ'মাস বয়স পেরিয়ে গেছে, এখন আর সি পি এম সরকার কি কি অপকান্ড করে রেখেছে তার লিস্টি ধরিয়ে দিয়ে নতুন সরকারের চলবে না। কাজ চাই কাজ। কাজ করে দেখাতে হবে। এখনই।

আমাদের সৌভাগ্য যে পশ্চিমবঙ্গে এ-কথাটা যিনি সবচেয়ে অন্তর থেকে অনুভব করেছেন তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টিভি-র সৌজন্যে আমরা সবাই দেখেছি আমরি-র ওই ঘটনার দিন তিনি কিভাবে পরিস্থিতি সামলেছেন, পরদিন পিজি হাসপাতাল চত্বরে বসে থেকে দেখভাল করেছেন যে ময়না-তদন্তের জন্য দেরি না হয়, যাতে মৃতদের আত্মীয়-স্বজন এরকম বুক-ভাঙ্গা যন্ত্রণার পর আর একপ্রস্থ হয়রানির শিকার না হন। এতে মৃতের আপনজনের শোক লাঘব হয়নি, কিন্তু তাঁরা পেয়েছেন দরদী এক দিদিকে, যিনি রাইটার্সের ঠান্ডা ঘরে বসে থেকে হুকুমদারি করে রাজ্য চালানোর ঘরানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন, যিনি মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের সঙ্গে তাঁদের দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নিতে জানেন।

আমরি-র ঘটনার পরে মমতার কাজ কোনও ব্যতিক্রম নয়। গত মে মাসে যখন বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোচ্ছে, দিকে দিকে তাঁর জয়-জয়কার, তখন টিভিতে সাক্ষাৎকারে তিনি বলছেন— আমাকে যখন কেউ বলে মাননীয়া মন্ত্রী, তখন আমার খারাপ লাগে। আমার ভাল লাগে যখন মানুষ আমাকে মমতা বলে ডাকে, দিদি বলে ডাকে। আমি তো দূরের লোক হয়ে থাকতে চাই না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি তাই করছেন যা তাঁর কাছে প্রত্যাশিত ছিল, এবং আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষে তাবৎ রাজনীতিকদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কাছেই এতটা প্রত্যাশা মানুষ করতে পারে। সেটা হল মানুষের সঙ্গে থেকে তাঁদের পায়ে কাঁটা কোথায় বাজছে সেটা বোঝা। তবেই না সে-কাঁটা তোলার চেষ্টা করা যাবে।

মমতার পথের বাধা

এ-কথা ঠিক যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথে বাধা বিস্তর। যাঁরা ভাবেন যে আগের সরকারই সব বাধা তৈরি করে গেছেন তাঁরা সমস্যার কেবল অর্ধেকটা দেখেন। তার চাইতে বড় বাধা হল আমাদের রাজ্যে কি সরকারমহলে কি রাজনীতিক মহলে ধান্দাবাজদের ঘুঘুর বাসা। আর নতুন সরকারে আমলারা খানিকটা ছড়ি ঘোরানোর বাড়তি সুযোগ পেয়েই যান। তাঁরা মূলত পুরনোপন্থী, রাইটার্স থেকে নানারকম প্যাঁচ কষেন, নিজেদের আখের গোছান। এ-ছাড়া বোঝার ওপর শাকের আঁটি ক্ষুদে রাজনীতিবিদরা আছেন— তাঁদের কেউ আছেন ডাক্তার হয়ে ডাক্তারদের নানান অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাব্যক্তিরূপে, কেউ বিভিন্ন স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের নেতা হয়ে। আবার কেউ আছেন সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে, পঞ্চায়েত থেকে মন্ত্রীমন্ডলী সর্বত্র এঁরা ছড়িয়ে আছেন নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার অ্যাজেন্ডা নিয়ে— এক-একজন লক্ষ্মণ শেঠ-এর অবতার সব। মজার কথা হল এঁদের অনেকেই এই সেদিনও সিপিএম-এর খুঁটি ছিলেন, আজ সুযোগ বুঝে ভোল বদলেছেন। আর পুরনো তৃণমূলীদের সকলেই কিছু ধোওয়া তুলসীপাতাটি নন। মমতা যে এগুলো একেবারে জানেন না তা নয়, কিন্তু রাজনীতিতে যেকালে বিশুদ্ধতা বজায় রেখেও ক্ষমতায় থাকা যেত সে সত্যযুগ হয়ত স্বাধীনতার আগে ছিল, এখন আর নেই, ফলে মমতাকে এইসব লোকেদের সঙ্গে নিতে হয়েছে। আশা করব তিনি খুব শিগগির এঁদের ঝেড়ে ফেলতে পারবেন। সি পি এম যে শুদ্ধিকরণের কথা বলে বলে গলা ভেঙ্গে ফেলল

কিন্তু কিছুই করল না, আতঙ্কের কথা এই যে সেই শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন তৃণমূল কংগ্রেসে এখন সবচেয়ে বেশি কেননা তারাই এখন ক্ষমতায়, তারা শুদ্ধ না হলে শুধু দলটা ডুববে না, পশ্চিমবঙ্গ ডুববে আরও গভীর গাড্ডায়।

নির্বাচনে জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু পুরোদমে সরকারি হাসপাতালগুলি পরিদর্শনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অসুবিধে বুঝতে চাইছেন, পরের মুখে ঝাল খেতে তিনি রাজি নন। ফলে মানুষের মনে একটা বিশ্বাস গড়ে উঠছে। ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা কাজ করতে চান তাঁরা উৎসাহ পাচ্ছেন, যদিও এটা বলার সময় এখনও আসেনি যে আগের জমানার মত স্বজন-পোষণ আর হবে না, কেননা আমলা আর ক্ষুদে নেতারা সব পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে নতুন জমানাকে এখনও নিয়ন্ত্রণ করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে দলতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বটে, কিন্তু এত সব একা হাতে দেখা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব।

প্রতিশ্রুতির খতিয়ান

ঝাঁ-চকচকে সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল এখন আমাদের রাজ্যে প্রায়োরিটি নয়, আমাদের প্রথম দরকার সর্বসাধারণের জন্য বিনা খরচায় বা বড়জোর নামমাত্র খরচায় মানবিক ভাবে চিকিৎসা। যাঁরা কিছু পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করাতে পারবেন তাঁদের জন্য ছোটো-বড় নানা নার্সিং হোম তো রয়েছে, তাদের সবাই যে কসাই তা মোটেই নয়। বরং আমি কয়েকটি ছোটো নার্সিং হোম জানি যাতে বাজারি মূল্যে, কিন্তু মোটের ওপর সততার সঙ্গে, চিকিৎসা করা হয়। বড় ব্যবসায়ীদের করা বড় হাসপাতালগুলো কিন্তু আমাদের ফাঁকি দিয়ে সরকারের টাকায়, যা কিনা আসলে আমার-আপনার টাকা, তাতেই ব্যবসা করে মুনাফা করছে। তার ফলে যে সব ছোটো-বড় নার্সিং হোম সৎভাবে ব্যবসা চালাতে চায় তারা অসম কম্পিটিশনের মুখে পড়ে সংকটে পড়ছে। বড় ব্যবসায়ীদের করা বড় হাসপাতালগুলো একচেটিয়া কারবারের সুযোগে লুটেপুটে নিচ্ছে।

চিকিৎসার জন্য বাঙালি প্রথম দক্ষিণ- যাত্রা শুরু করে দুটো জায়গায়। এক হল ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ, ভেলোর। সেটি বেসরকারি বটে, কিন্তু ব্যবসায়ীদের তৈরি নয়, ক্রিস্টান মিশনারীদের তৈরি পুরনো মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। অন্যটি হল শঙ্কর নেত্রালয়— সেটাও এক অ-লাভজনক সংস্থার দ্বারা অল্প পুঁজিতে আস্তে আস্তে গড়ে ওঠা হাসপাতাল। কাজেই বড় ব্যবসায়ীদের বড় পুঁজি আনলেই ভাল ডাক্তারি হবে না, তার জন্য সেবার মানসিকতা ও ভাল অর্থে যাকে 'পেশাদারিত্ব' বলে সেটা চাই। সেটা তৈরি করার কোনও মুষ্ঠিযোগ, কোনও চটজলদি সমাধান নেই। আর এখন বাঙালি রোগ হলেই মুম্বাই-চেন্নাই করছে তার কারণ শুধু এখানকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেহাল অবস্থা নয়— মুম্বাই-চেন্নাই- এর বহু দামি প্রাইভেট হাসপাতাল এখান থেকে 'রোগী তুলবার' এক নেটওয়ার্ক, এমনকি দালাল চক্র গড়ে তুলেছে, তার ভাঁওতা দিয়ে 'এখানে কিছু হয় না' বলে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে অসহায় রোগীদের ফুসলে নিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ভাবতে হবে। আরও গভীরভাবে ভাবতে হবে যে কোন পথে মানুষের সেবা করা যায়। তাঁর প্রতি আমাদের আস্থা আছে। যদি দেখতাম তিনি নিজের মা'কে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য তাহলে আমাদের আস্থা হুশ হয়ে যেত। তিনি তা করেন নি, তাঁর মাতৃবিয়োগে আমাদের সমবেদনা তাই স্বতঃস্ফূর্ত।

শেষ কথা

আমি রাজনীতি তত বুঝি না, তবু এটুকু বুঝি যে একজন-মাত্র মানুষের ওপর সব আশা-আকাঙ্ক্ষার ভার চাপিয়ে দেবার একটা বিপদ আছে। সে মানুষটি তাঁর দল তাঁর মন্ত্রিসভা তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতার ঊর্দ্ধে উঠে যেতে পারেন। একনায়ক হয়ে উঠতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্ত শ্রদ্ধার পাত্রী আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়া মহাশ্বেতা দেবী এই সেদিন প্রকাশ্যে আক্ষেপ করেছেন— আমরা কি ফ্যাসিস্ত শক্তিকে ক্ষমতায় ডেকে আনলাম? আমি জানিনা এ-প্রশ্নের কি উত্তর হতে পারে, শুধু জানি এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় এখনও আসেনি। যদি এ-প্রশ্নের উত্তরে কোনোদিন বলতে হয়, হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গের জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গদিতে বসিয়ে ফ্যাসিস্ত হতে দিয়েছে, তবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণই সেদিন তাঁকে টেনে নামাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি যতই বড় ভাবিনা কেন, তিনি তো কেবল জনগণমন-অধিনায়িকা হিসেবেই বড়। সেটা আমি ভুলিনি, মনে হয় তিনিও ভোলেন নি।

আমার প্রিয় কবি ও গায়ক কবীর সুমনের কথা ধার করে এই প্রবন্ধের নামকরণ করেছি, যদিও সুমন নিজে মমতার ওপর আস্থা হারিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একজন মুখ্যমন্ত্রী-স্বাস্থ্যমন্ত্রী পেয়েছেন যিনি তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন— এই-ই আমার কাছে এই দুর্দিনে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। আশা রাখি পেয়ে যাব বাকি দু-আনা।

আশা রাখি, বন্ধু, আশায় বাঁচে চাষা, আর এই মানব-জমিনে আমি এক আনাড়ি চাষা আশাই শুধু করে যেতে পারি, আশা করে যেতে পারি একদিন, কোনও উজ্জ্বল একদিন, এইসব ভুল পদক্ষেপগুলি সংশোধন করে এই সরকার মানুষের জন্য, গরিব মানুষের জন্য, আমার আপনার জন্য, উপযুক্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য : পরিবর্তন কি ‘প্রত্যাবর্তন’-এর পথে?

অমিতাভ চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন ‘পরিবর্তন’-এর সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কোন পথে চলেছে? বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যের আকাশে যে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা গিয়েছিল, তার মেঘগুলো কি উধাও হয়ে গেছে? না কি সিঁদুরে মেঘের দল ২০০ দিনের পরিবর্তনের সরকারের কাঁধে ভর করে ‘আবার এসেছি ফিরে’ বলে প্রবল হুঙ্কারে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে চলেছে।

বিষয়টা বোঝার আগে কিছু তথ্যের দিকে চোখ ফেরানো যাক—

● বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশমতো প্রতি হাজার মানুষ-পিছু ৩টে রোগীর শয্যা থাকা উচিত, অথচ পশ্চিমবঙ্গে আছে ১.১৬ টা।

● পশ্চিমবঙ্গের ২৩৮৬টা হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ৩৮৫টা সরকারী। মাত্র ১৬ শতাংশ হাসপাতাল সরকার পরিচালিত— তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহারে এই বিষয়টাকে জনগণের প্রতি অপরাধমূলক কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

● পশ্চিমবঙ্গের ৭২ শতাংশ মানুষ গ্রামে থাকেন, অথচ সমস্ত সরকারি হাসপাতালের মাত্র ২৫ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে।

● সারা রাজ্য-জুড়ে স্বাস্থ্যকর্মী, হাসপাতাল শয্যা এবং প্যারামেডিকাল কর্মীর অভাব।

● রাজ্যে মেডিকাল কলেজ রয়েছে ৭টা। প্রতি ৫০ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু ১টা মেডিক্যাল কলেজের হিসেবে ১৭ টা মেডিক্যাল কলেজ দরকার।

এই তথ্যগুলো গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রকাশিত তৃণমূল কংগ্রেসের ইংরেজি ইস্তেহার থেকে নেওয়া।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংকটের মোকাবিলা করার জন্য এই ইস্তেহারে ‘পশ্চিমবঙ্গকে পুনর্গঠিত কর’ শিরোনামে বেশ কিছু কর্তব্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। পুনর্গঠনের এই পরিকল্পনার ৪ নম্বর পয়েন্টে বলা হয়— ‘গ্রামীণ স্বাস্থ্যের প্রতি প্রাথমিক নজর দিয়ে স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে পুনরুজ্জীবিত কর’। তিনটে কাজের কথা বলা হয়—

১. ‘হাব এন্ড স্পোক মডেল’ অর্থাৎ সাইকেলের চাকার মতো মডেল গড়ে তোলা যাতে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি হেল্‌থ সেন্টার, জেলা হাসপাতাল, মহকুমার বিশেষজ্ঞ হাসপাতাল, কলকাতার অতিবিশেষজ্ঞ হাসপাতাল এবং রাজ্যের সমস্ত জেলাকে সংযুক্ত করা যায়।

২. রাজ্য-জুড়ে রোগ-পরীক্ষা কেন্দ্র বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার সুষমভাবে গড়ে তোলা।

৩. তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে রাজ্য-জুড়ে স্বাস্থ্যপরিষেবার পিরামিডের তলার সঙ্গে উপরকে যুক্ত করা।

এছাড়া ৫ নম্বর পয়েন্টে সকলের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করার মতো কিছু কর্তব্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস তার প্রথম ২০০ দিনের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে ‘অ্যাকশান এজেন্ডা’ ঘোষণা করে তার পদক্ষেপগুলো এ রকম—

১. চার স্তর বিশিষ্ট স্বাস্থ্যপরিষেবা পরিকাঠামো গড়ে তোলা— যেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মহকুমা হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, অতিবিশেষজ্ঞ হাসপাতালগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে ‘হাব এন্ড স্পোক মডেল’-এ জুড়ে নেওয়া হবে।

২. বেসরকারী বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে এক যথাযথ নীতি গ্রহণ করা।

৩. রাজ্যের গরীবদের দিকে লক্ষ্য রেখে এক ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা চালু করা।

৪. গ্রামীণ স্বাস্থ্যপরিষেবা ক্ষেত্রগুলো অবিলম্বে নজর দাবী করে। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন-এর ঠিক করা নীতি অনুসারে প্রতিটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং কমিউনিটি হেল্‌থ সেন্টারের যথাক্রমে ৫০০০, ৩০০০০, ১ লাখ ২০০০০ মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার কথা। এই তথ্য অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০০ শতাংশ ও কমিউনিটি হেল্‌থ সেন্টারে ৫০ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে।

এ সমস্ত দিক বিবেচনা করে সরকার এই ক্ষেত্রগুলোতে ঘাটতি দূর করবে এবং সেই সঙ্গে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবার গুণগত মান উন্নত করতে নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তাছাড়া সরকার ঐ ২০০ দিনের মধ্যে প্রতি মহকুমায় একটা করে বহুমুখী পরিষেবা-সম্পন্ন হাসপাতাল গড়া সুনিশ্চিত করতে কাজ করবে।

এই কর্তব্যগুলো সম্পন্ন করতে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব নেন। রাজ্যবাসীর অনেকে আশা করেছিলেন যে মমতা দেবী কাজের মানুষ সৎ এবং সি পি এম আর কংগ্রেসিদের মতোন নন, একটু অন্য ধাঁচের মানুষ; তাই স্বাস্থ্য দপ্তর উনি যখন হাতে নিয়েছেন তখন কিছু সুফল তো মিলবেই।

ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ১০০ দিনে আমরা কি দেখলাম—

১. ২৪শে মে বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজিতে মুখ্যমন্ত্রী নিজে পরিদর্শনে গেলেন এবং সে হাসপাতালের প্রধানকে বরখাস্ত করলেন। এরপর তিনি কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালে পরিদর্শন করতে শুরু করলেন। জনগণ আশা করলেন এবার একটা কিছু হবে।

২. ৩০শে জুন থেকে বি সি রায় শিশু হাসপাতালে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে ১৯ জন শিশুর মৃত্যু হল। সরকারি তদন্ত কমিটি জানালেন এই মৃত্যুতে হাসপাতাল বা ডাক্তারদের কোনো দায় নেই। নির্বিচারে শিশুদের রেফার করাই এর জন্য দায়ী। জেলা স্তরে শিশু চিকিৎসার পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হল।

৩. কলকাতায় স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সভায় অনেক কথা বলা হল। শহরের হাসপাতালে চাপ কমানো, অপ্রয়োজনীয় রেফারেল বন্ধ করা, গ্রাম-মহকুমা-জেলা হাসপাতাল ঢেলে সাজানো, চিকিৎসক ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যাবৃদ্ধি, পরিকাঠামোর উন্নতি— এসব আলোচিত হল। এছাড়া ২০১১-'১৫ সালের মধ্যে রূপায়ণের জন্য অ্যাকশন প্ল্যান ঘোষণা করা হল, যেখানে সকলের জন্য হেল্‌থ কার্ড, প্রতিটা জেলা হাসপাতালে অসুস্থ নবজাতকদের জন্য 'সিক নিউবর্ন ইউনিট' চালু করা, জঙ্গল মহল-সুন্দরবন-চা বাগান-বন বস্তি-খনি এলাকায় মোবাইল মেডিক্যাল ভ্যান চালু করা, সদ্য-পাশকরা ডাক্তারদের ১ বছরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে পাঠানো— প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

অন্য দিকে আমরা কি দেখছি?

● ঘোষণা করা হয়েছে ভবানীপুরের রামরিখ দাস, পাইকপাড়ার ইন্দিরা মাতৃসদন এবং চিৎপুরের নর্থ সাবার্বন— এই তিনটে সরকারী হাসপাতাল পি পি পি মডেলে চালানোর জন্য বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়া হবে। আমরা জানি পি পি পি হল সরকারী সম্পত্তি ব্যবহার করে বেসরকারী মুনাফার মডেল, যে মডেল বামফ্রন্ট সরকারের উৎসাহ পেয়েছে।

● এছাড়া জেলায় স্বাস্থ্য ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে হাসপাতাল গড়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

● শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন ডা. দেবী শেট্টির সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটা চুক্তি হয়েছে যার ফলে তাঁরা শিলিগুড়ি ও বোলপুরসহ ছয়টা জেলায় সরকারি হাসপাতালের চত্বরে স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তুলবেন।

● বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে রাজ্যের ১৫টা জেলায় সুপারস্পেশালিটি সেন্টার গড়া হবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ভাত রান্নার সময় চাল সেদ্ধ হয়েছে কিনা তা বুঝতে দু-একটা চাল টিপে দেখা হয়। তেমনি গত ২০০ দিনে স্বাস্থ্য নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষণা ও কাজে আশংকা হচ্ছে— এই সরকার গত সরকারের পথেই চলছে নাতো!

বামফ্রন্টের আমলের প্রথম দিকে তৎকালীন স্বাস্থ্য-মন্ত্রী প্রয়াত প্রশান্ত শূর হাসপাতালে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শাসন করতেন এবং বহু প্রতিশ্রুতি দিতেন। তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি আমরা দেখেছি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর শাসনকে অগ্রাহ্য করে সরকারী হাসপাতাল চলছে মোটামুটি আগেরই মতো।

যে কোনো ভালো স্বাস্থ্যনীতির মৌলিক বিষয় হল সমাজে রোগের বোঝা কমানোর পরিকল্পনা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়া সে পরিকল্পনার অধীনে থাকে, তার উপরে নয়। রোগের বোঝা কমাতে চাই— পুষ্টি ও নিরাপদ পানীয় জল, উন্নত পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশী ব্যবস্থা এবং কার্যকরী টীকাদান প্রকল্প। কেরালা, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ— এই চারটে রাজ্যে নিরাপদ পানীয় জল, উন্নত পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশী ব্যবস্থা সব থেকে খারাপ, উন্নয়নের জন্য দরকার ৯০,০০০ কোটি টাকা। National Commission on Macroeconomics & Health-এর রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ১২৮৬ কোটি টাকা, জল ও পয়ঃপ্রণালী ক্ষেত্রে ২৪৫৯ কোটি টাকা, পুষ্টির জন্য ৪৬৯৩ কোটি টাকা, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ১৩৮১১ কোটি টাকা এবং রাস্তাঘাটের জন্য ৮৪৮৫ কোটি টাকা প্রয়োজন। আর এই প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকরী বিনিয়োগ রাজ্যের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে জড়িত। আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না এই বিনিয়োগ হবে কিভাবে!

আমরা আশঙ্কার সঙ্গে দেখছি ২০০ দিনের অ্যাকশন এজেন্ডার যেটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তা হল হাব এন্ড স্পোক মডেল অনুসরণ করে বেসরকারী স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের গ্রাম থেকে শুরু করে শহরের মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। হাসপাতালের জমিতে বাড়ী গড়ে, ডায়াগনোস্টিক সেন্টার বসিয়ে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করবে, মুনাফা করবে। বেসরকারী ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের জন্য বাঁধা রোগী যোগাবে সরকারী হাসপাতাল।

এই সমগ্র পরিকল্পনায় দেখা যাচ্ছে সরকার জেলায় বা মহকুমায় পি পি পি মডেলে হাসপাতাল তৈরীর জন্য জমি যোগাড় করে দেবে, লীজ দেবে ৩০ বছরের জন্য বা যতদিন না বেসরকারী সংস্থা লাভের মুখ দেখবে ততদিন অবধি, তারপর আবার লীজ পুনর্নবীকরণ করা হবে। পি পি পি মডেলে গড়ে ওঠা হাসপাতালগুলো যাতে প্রতিযোগিতার মুখে না পড়ে তাই সে সব জায়গায় সরকারী হাসপাতাল আগামী ১০ বছর কোনো সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা দেবে না, বা এখন দিতে থাকলে বন্ধ করে দেবে। আশ্চর্যের কথা, পি পি পি

মডেলে অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীদের উপর সরকার কোনো শর্ত চাপায়নি, বরং তাদের শর্তগুলো সরকারকে জানাতে বলা হয়েছে। (West Bengal Medical Services Corporation website)

গ্রামীণ ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিয়ে স্বাস্থ্যপরিষেবা গড়ে তোলার কথা ঘোষণা হলেও গত ২০০ দিনে গরীব মেহনতী মানুষের স্বাস্থ্যের দুরবস্থা লাঘবের কার্যকরী পদক্ষেপ নজরে পড়ছে না। রাজ্যের গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাপরিষেবায় উন্নতির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কিছু ঘোষণা ছাড়া স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আর যা যা হয়েছে বা হচ্ছে তা সি পি আই এম সরকার বা কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার অনুসৃত বিশ্ব ব্যাংক-DFID নির্দেশিত নীতির অনুসরণ মাত্র। তাই মনে হচ্ছে তৃণমূলের পরির্বতনের স্বাস্থ্যনীতি বামফ্রন্টের স্বাস্থ্যনীতিতেই প্রত্যাবর্তন যে স্বাস্থ্যনীতি জনবিরোধীরূপে প্রমাণিত। কোনো কোনো বন্ধু অবশ্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তৃণমূলের গত ২০০ দিনের কাজ-কর্ম দেখার পরেও বলছেন— 'রাজ্যের প্রকৃত উন্নতির লক্ষ্যে তাদের সদিচ্ছাকে পশ্চিমবঙ্গবাসী সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। এই বন্ধুরা বর্তমান সরকারকে সুপরামর্শ যোগাতে চাইছেন কেন না— সরকার নতুন অথচ আমলারা প্রায় অপরিবর্তিত, এই স্বার্থান্বেষী দুর্নীতিপরায়ণ আমলারা নতুন সরকারকে বিপথে চালনা করতে চাইবে এবং তারা 'ধিক্কৃত সি পি এম জমানার অনুসৃত পথই অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে।' যে সরকার আলো করে আছেন বণিকসভার প্রাক্তন কর্ণধার অমিত মিত্র, আমলাকুল-শিরোমণি মণীশ গুপ্ত, বাম আমলের দুর্নীতিপরায়ণ অত্যাচারী পুলিশ অফিসারেরা, তার মন্ত্রিসভার সদিচ্ছা ও অপাপবিদ্ধতা নিয়ে গণস্বাস্থ্য-আন্দোলনের এই সাথীরা এখন চিন্তিত। তৃণমূলের ইস্তেহারে 'চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোর জনস্বাস্থ্যপরিষেবা উন্নয়নের জন্য জরুরী যে বিশেষজ্ঞ পরিষদ' গড়ার কথা বলা হয়েছিল তার দাবীতে এই বন্ধুরা সোচ্চার হচ্ছেন। আমরা এই বন্ধুদের সঙ্গে একমত নই। বন্ধুদের এটা বুঝতে হবে কিছু জনমোহিনী ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের স্বাস্থ্যোদ্ধার হবে না। প্রয়োজন ভ্রান্ত স্বাস্থ্যনীতির পরিবর্তন। এর কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ২০০ দিনে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারের তরফে কী বলা হয়েছে তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো কী করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে চমক লাগানো কিছু 'সারপ্রাইজ ভিজিট' এবং প্রতীকী কিছু ঘোষণা ছাড়া স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ২০০ দিনের সরকারের কাছে জনগণের প্রাপ্তি শূন্য। জানি এখন শাসকদলের বিরোধিতা করলেই বিরোধী শক্তি অর্থাৎ সি পি এম-এর দালাল হিসেবে চিহ্নিত হতে হবে (যেমন এক সময় বাম সরকারের বিরোধী মাত্রেই তৃণমূলের দালাল হিসেবে চিহ্নিত হতেন), তবু বলব স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মধ্যে সি পি এমের স্বাস্থ্য নীতিতে প্রত্যাবর্তনের ছায়াই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

With Best Wishes from

A
Well
Wisher

জীন পরিবর্তিত খাদ্যের কথা

খাবার নিয়ে ভাবার আছে। আমাদের মতো গরীবের দেশে সবাই পেটভরে খেতে পায় না। সবুজ বিপ্লব সাময়িকভাবে খাদ্যের যোগান বাড়ালেও শেষে তা পরিবেশ ধ্বংস করেছে, খাদ্য উৎপাদন-বৃদ্ধিও দীর্ঘমেয়াদী হয়নি। তবে কি জীন-পরিবর্তিত খাদ্যের হাত ধরে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবই সমাধান দেখাবে? এই নতুন প্রযুক্তির ফলে কিরকম খাবার আমাদের পেটে পড়বে? এই নতুন প্রযুক্তির মালিক কারা? কাদের সুবিধা হবে, কাদের হবে অসুবিধা? শেষ পর্যন্ত এতে খাদ্যের ভাঁড়ার সত্যিই বাড়বে কি? আলোচনা করেছেন **ড. শুভাশিস মুখোপাধ্যায়।**

পূর্বরাগ

খাদ্যের বাজারে আগুনের আঁচ এখন মধ্যবিত্তদের হেঁসেলেও উঁকি দিচ্ছে। যেসব মরসুমি সব্জি শীতের আমেজি দুপুরে আমাদের মৌতাত জমানোর অনুপান, তাদের মূল্য উর্দ্ধমুখী। এ বাবদে কর্তাদের নিদান হলো যে ভারতের চাষীরা বড়ই অলস, তারা কাজ না করে কেবল মজুরি বাড়ানোর ফিকির খোঁজে। উৎপাদনের বেলায় তারা ইউরোপ-মার্কিন দেশের আদর্শ চাষীদের চেয়ে কয়েক মাইল পেছনে পড়ে রয়েছে। অতএব চাই উচ্চফলনশীল বীজের ফলে উৎপন্ন কৃষিপণ্য। অলস চাষীদের একবার কোনও মতে মাঠে নামাতে পারলে একই সময়ে দুগুণ-চারগুণ ফসল উৎপাদন হবে। মধ্যবিত্ত-র রিলিফ। এক ঢিলে দুই পাখি।

কিন্তু গোল বেধেছে একেবারে গোড়ায়। যে উচ্চফলনশীল গমের বীজ পাঞ্জাবে রেকর্ড পরিমাণ গম উৎপাদন করে তাক লাগিয়ে দিয়ে সত্তরের দশকের 'সবুজ বিপ্লব'-এর জন্ম দিয়েছিলো, সেই হেন রূপকথার রাজ্য পাঞ্জাব আজকে সারাদেশে গম রপ্তানি করার বদলে দেশ-বিদেশ থেকে গম আমদানি করছে। সেই আমদানি করা গমও রাজ্যের অধিকাংশ মানুষকে দুবেলা দুমুঠো জোগাতে পারছে না।

কর্তারা তাই আর বুক ঠুকে সবুজ বিপ্লব বলতে পারছেন না। তাঁদের ঢোঁক গিলে বলতে হচ্ছে— না, পাঞ্জাব-ধাঁচের প্রথম 'সবুজ বিপ্লব' ব্যর্থ হয়েছে। পাঞ্জাব বা মহারাষ্ট্রে গিয়ে তাঁরা আর 'আশ্চর্য উচ্চ ফলনশীল বীজ'-এর স্বপ্নিল কাহিনী শোনাতে পারছেন না।

এমন এক বিপদে পড়ে 'সবুজ বিপ্লবপন্থী' এক নতুন পথের সন্ধানে তাঁদের মেধা, পেশিশক্তি এবং রাষ্ট্রকে এক 'নতুন' ধারণার পেছনে সমবেত করলেন। এই তিন শক্তির সমাহারে যা বেরিয়ে এলো তার কাহিনী হলো আজকের জীন-পরিবর্তিত খাদ্যের কিস্‌সা। কু'লোকে বলে কুর্সি বাঁচানোর কিস্‌সা।

যা ঘটছে এক কথায় তাকে বলা যেতে পারে 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'। যে মার্কিন দেশের হাত ধরে, তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যে ভারতের সামনে উদ্যত খাদ্য সমস্যার সমাধান হিসেবে 'প্রথম সবুজ বিপ্লব'-এর জন্ম হয়েছিল, খোদ মার্কিন দেশেই সেই বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর কর্তরা বলছেন এখন দরকার আরও গাঢ় রং-এর 'সবুজ বিপ্লব'। তবে তা ঘটানো হবে ভারতের মতো কৃষি-বৈচিত্র্যের দেশে, 'দুগুণ হরিৎক্রান্তি' বা ডাব্‌লি গ্রীণ রেভেলিউসন! 'কৃষি-জ্ঞান-উদ্যোগ' নামক ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক একটি চুক্তির মাধ্যমে যার শুভ মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মনমোহন সিং-এর মার্কিন সফরের পর।

ইতিহাস আর ভূগোলের গোলমাল

ইউরোপীয় জাতিগুলোর বাসস্থানে রোদ্দুর অমিল, ঋতুচক্রে শীতকালের দাপট এবং সময়কালও দীর্ঘ। বরফে ঢাকা ক্ষেত-খামার কৃষিকাজের অযোগ্য থাকে বছরের বেশ একটা সময় জুড়ে। খাবার সংগ্রহ করে শীতকালের জন্য ভাঁড়ারে জমিয়ে রাখার সংস্কৃতিতেও তারা অভ্যস্ত। কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় মানিয়ে নেওয়া, হাতে গোনা কটা ফসল ছাড়া তাদের ভাঁড়ারে সর্বদাই মা-ভবানী বিরাজ করেন।

ইউরোপীয় জাতিগুলো এক সময় খাদ্য, রান্নার মশলা (যা রান্নাকে সংরক্ষিত রাখে বেশ কয়েকদিন) থেকে শুরু করে সুগন্ধীদ্রব্য, কাপড় বোনার তুলো ইত্যাদির খোঁজে যে দেশগুলোয় হানা দিয়েছিলো, সেই দেশগুলোকে তারা দুই বিশ্বযুদ্ধের আগে-পরের সময়কালে আর্থিক সম্পদ এবং খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকে একেবারে রিক্ত, নিঃস্ব করে দিয়ে চলে যায়। এই দেশগুলোকে আজকের দিনে হাল্কা চালে তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলা হয়। এই দেশগুলোর আবহাওয়া মূলত উষ্ণ, বৃষ্টিপাত হয় কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায়, নদী-মাতৃক উর্বর মাটির অববাহিকা-পূর্ণ স্থলভূমিতে ঐ সমস্ত দেশের কৃষিকাজ চলে। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক কারণে এই সমস্ত দেশগুলোতে রয়েছে অতুলনীয় কৃষি-বৈচিত্র্য।

ইতিহাসে বর্ণিত ইউরোপের বিখ্যাত 'পীত-ক্ষুধা'র সময়ে প্রাথমিকভাবে স্রেফ পেটভরে খাওয়ার তাগিদে ইউরোপীয় জাতিগুলো তাদের নিজেদের জীব ও খাদ্য-বৈচিত্র্যের ঘাটতির দেশগুলো ছেড়ে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার খাদ্য-বৈচিত্র্য ভরপুর দেশগুলোর খাদ্য-সম্পদ দখলের জন্য অভিযান চালায়। তখনই তারা প্রথম বুঝতে পারে যে এই সব দেশগুলোর খাদ্যবৈচিত্র্যের মূলকথা হলো সেই দেশগুলোর অনন্য কৃষিজাত দ্রব্য, ইউরোপের তুলনায়

কৃষিকাজের ভিন্ন ধরণ। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ইউরোপের দেশগুলোর পক্ষে গ্রহণ করা কঠিন। তারা চাইলো এই কৃষি-বৈচিত্র্যেকে তাদের দেশের মতো করে রূপান্তর। ভারতের কৃষকদের সময়ের পরীক্ষায় পাশ করা জীব-প্রযুক্তির পরিবর্তে ইউরোপীয় খাদ্য-ব্যবসায়ীদের জন্য প্রয়োজনীয় চট্‌জলদি, দ্রুত মুনাফা লাভের অনুকূল জীব-প্রযুক্তি। ইতিহাস আর ভূগোল দিয়ে নির্মিত এই চালচিত্র বা প্রেক্ষিতটি হিসেবে রেখে আমরা জীব-পরিবর্তিত খাদ্য নিয়ে দু-চার কথা বলবো।

জীন-পরিবর্তিত খাদ্য পটভূমি

কৃষি আবিষ্কারের পাশাপাশি মানবসমাজ তার চারপাশের প্রকৃতি-পরিবেশকে অপ্রত্যাহারযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। পৃথিবীর আদি সভ্যতার পীঠস্থানগুলো, যেমন আফ্রিকার মেসোপটেমিয়া বা নীলনদ সভ্যতা, মধ্য এশিয়ার মহেঞ্জদারো-হরপ্পা বা লাতিন আমেরিকার ইনকা-মায়া সভ্যতার আদি কৃষকবৃন্দ বুনো গাছ, বুনো ফলকে মানবজাতির খাওয়ার উপযোগী ফসল বা খাদ্যে পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রাকৃতিক প্রজনন পদ্ধতি হলো সংকর পদ্ধতি, যেখানে একটি বীজের সঙ্গে অন্য একটি বীজ বা একটি ফুলের সঙ্গে অন্যজাতের ফুলের পরাগ-রেণু দিয়ে নিষিক্ত করার পদ্ধতি।

এই ফল বা ফসলগুলো তাদের আদি পূর্বসূরীদের চেয়ে মৌলিকভাবে পৃথক কিছু নয়। এ যেন ঠাকুরদার সঙ্গে তাঁর নাতির ছেলের যে আকৃতিগত তফাৎ সেটুকুই..... অন্যদিকে এই দুই প্রজন্মের মধ্যে ধাতুগত মিলের দিকটাই হলো মূলকথা। বিভিন্ন বীজ বা পরাগ-রেণুর মাধ্যমে নানান ফসলের বিভিন্ন ধর্ম মিশেল দেওয়ার কৃষকদের নির্মিত এই জৈব-প্রযুক্তিতে একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যসম্পন্ন প্রজাতির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে উদ্ভূত ফসল বা আম-জাম-কলা-র মতো ফলগুলোর মধ্যে প্রকাশিত একটি বা কয়েকটি প্রবণতাকে বিবর্তিত করা হয় (যেমন কালো রং-এর ধান থেকে ফিকে রং-এর ধানে রূপান্তর)। জলায় জন্ম নেওয়া অপেক্ষাকৃত কম প্রোটিনযুক্ত, কম ফলনশীল, প্রায় তেতো স্বাদের বুনো ধানগাছ হয়ে ওঠে আজকের অপেক্ষাকৃত বেশী প্রোটিনসমৃদ্ধ, সাদা রং-এর স্বাদযুক্ত চালের উৎস ধানগাছ। এই কৃতিত্ব আদি কৃষকদের। এই 'নতুন' ধান পৃথিবীর পরিবর্তনশীল প্রকৃতি-পরিবেশে নিজেদের সহজেই মানিয়ে নিয়ে তাদের আদি আত্মীয়-কুটুম্বদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে সহাবস্থান করছে।

যুগ যুগ ধরে এই সংকর জাতের শস্যগুলোর ধর্ম অপরিবর্তিত ও সুষম থাকায় বলা যায় যে তারা সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

হতে পেরেছে। কৃষকদের দ্বারা অনুশীলন করা এই কৃষি-বিজ্ঞান জীব-বিজ্ঞানের মূল সূত্র বা ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যে যে প্রজাতির মধ্যে সংকর ঘটিয়ে কৃষকরা নতুন ধর্মসম্পন্ন ফসল বানিয়েছেন, তাদের পরাগ ঐ প্রজাতিগুলোর পরস্পরকে নিষিক্ত করতে সক্ষম। কৃষকরা শুধু ক্রমাগত কৌশলী নির্বাচনের মাধ্যমে একই ধর্ম সম্পন্ন ফসল নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন।

জীন-প্রযুক্তি

কৃষকদের যে কৃষি-প্রযুক্তির কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হলো, আজকের জীন-প্রযুক্তি ঠিক এর বিপরীত অবস্থান থেকে শুরু করে। আধুনিক জীন-প্রযুক্তি শুরুই হয় যে, যে কোনো প্রজাতির মধ্যে, অন্যান্য যে কোনো গণ বা প্রজাতির জীন সংস্থাপন করা সম্ভব এবং তা সংস্থাপিত ফসলের কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় না। তাই এই প্রযুক্তি চায় ফসলের বা প্রকৃতি থেকে সরাসরি আহরণ করা যায় এমন খাদ্যের মধ্যে 'মানবজাতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন' ঘটানোর জন্য অন্য যে কোনও প্রাণী বা গাছ থেকে প্রয়োজনীয় জীন ধার নিয়ে সেই ধার-করা জীনটিকে ফসলের মধ্যে সংস্থাপন করতে। এই ধার-করা জীনগুলো মূলত 'বিজাতীয়' জীব। যে প্রাণীর থেকে এই জীনগুলো ধার করে অন্য ফসল বা প্রাণীর জীন-সমষ্টির মধ্যে চালান করা হচ্ছে, সেই দুটি প্রাণীই দেখা যাচ্ছে প্রায়শই পরস্পরের সঙ্গে প্রজননক্ষম নয়। এই কারণেই আমরা এই সব 'বেজন্মা' ফসল প্রকৃতিতে দেখতে পাইনা।

এই পদ্ধতি চাষীদের পরিচিত সংকর পদ্ধতি নয়। এই সংস্থাপন স্বাভাবিক পরাগ-মিলন পদ্ধতিতে ঘটানো যায় না— এর জন্য প্রয়োজন শল্য পদ্ধতি। এই সংস্থাপনের ফলে ধরে নেওয়া হয় যে ধার-করা জীনটি সংস্থাপিত ফসলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে ঐ ফসলের মধ্যে ঐ জীনটির নির্দিষ্ট আপন গুণাবলী প্রকাশ করবে। এই পরীক্ষার 'সফল' কৃষিজাত দ্রব্য হলো হলুদ, বেগুনি প্রভৃতি হরেক রং-এর ক্যাপসিকাম। তামাকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে জোনাকি পোকার আলোর উৎস হিসেবে যে বস্তুটি ক্রিয়াশীল, সেই রাসায়নিকটি উৎপাদনের জীনটি। এই জীনটির প্রভাবে অমাবস্যার আঁধার রাতে তামাক গাছের ক্ষেত এক অতিকায় জোনাকি পোকার মতো স্নিগ্ধ আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায়।

সুকুমার রায় মজা করে লিখেছিলেন, ''নীম গাছেতে ফলছে সীম''। অতটা না করা গেলেও জীবপ্রযুক্তি বেচা-কেনার ব্যবসায় নিযুক্ত কোম্পানিগুলোর পয়সায় গবেষণা করা বিজ্ঞানীবৃন্দ টমাটো গাছে প্রায় আপেলের স্বাদযুক্ত টমাটো ফলাচ্ছেন! এই জাতীয় কৃতিত্বের তালিকাটা দীর্ঘ। তালিকার দিকে নজর করলে আমাদের ছোট বেলায় পড়া কল্পবিজ্ঞান কাহিনী, ''ড. মোরো-র দ্বীপ''-এর কথা মনে পড়তে পারে। বিজ্ঞানী মোরো মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে 'মনুষ্যত্ব' প্রদানের সদিচ্ছায় বিভিন্ন প্রাণীর অবয়ব এবং স্বভাবের ইচ্ছে মতো পরিবর্তন করে তাদের মানুষের আরও কাছাকাছি আনতে চাইতেন। এই ভয়ানক পরীক্ষার পরিণামে আমরা কাহিনী থেকেই জানতে পেরেছি— মোরোর সৃষ্ট প্রাণীকুল বিপুল উদ্যমে বিদ্রোহ করেছে। সৃষ্টির এই মাদক মহাযজ্ঞে মাতোয়ারা আজকের বিজ্ঞানীরা বুঝি এমন বিদ্রোহী প্রাণীরই 'জন্ম' দিচ্ছেন।

বিষয়টি যতই কৃতিত্বের বা সিরিয়াস বিজ্ঞানের দাবিদার হোক না কেন, এই পুরো পদ্ধতিটি স্রেফ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিরাট প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন হয়েছে। এই প্রশ্নগুলোর সঙ্গে যে আশঙ্কাগুলো জড়িত, সেগুলো বিজ্ঞানীদের কাছে নিছক কৌতুহলের বিষয়বস্তু হলেও আমাদের মতো আমজনতার কাছে তা প্রায় জীবন-মরণ প্রশ্নের সমান!

যুক্তি-তক্কো-গল্প:

প্রকৃতি যখন একটি প্রজাতির বিবর্তনকে অন্য প্রজাতিতে পরিবর্তন করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে (এর পেছনে কোনো মহান ছক নেই, স্রেফ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিরন্তন পরিবর্তন), তখন সেই পরিবর্তনের সময়কাল হয় দীর্ঘ। একটি প্রজাতির অন্য একটিতে পরিবর্তিত হতে সময় লাগে কয়েক হাজার বছর। এরূপর পরিবর্তিত প্রজাতিটি টিকে থাকবে কি না তা নিয়েও প্রকৃতি-পরিবেশে স্থাপিত প্রজাতিটিকে নানান পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। ক্রমাগত নানান জটিল পরীক্ষায় ক্রমাগত উত্তীর্ণ

হতে পারলে সেই প্রজাতিটি এক সময় প্রকৃতি-পরিবেশে একটি সুস্থিত স্থান গ্রহণ করে। প্রকৃতিতে শুক্রের প্রসার ঘটে একটি ছন্দোবদ্ধ পদ্ধতিতে। ত্বরাহীন এ এক অনন্ত পরীক্ষা-পদ্ধতি। ধারাবাহিক ভাবেই এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে নিরন্তর।

জীন-প্রযুক্তিজাত খাদ্য (বা জীন-প্রযুক্তিজাত প্রাণী বা জিএমও) সময়-পরীক্ষিত প্রকৃতি-পরিবেশ অনুমোদিত এই দর্শনের ঠিক বিপরীত পদ্ধতিটি অনুসরণ করে। প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রজাতির (ক্ষেত্রবিশেষে এমনকি একই পরিবারভুক্ত হলেও) মধ্যে প্রজননের যে স্বাভাবিক অবরোধ বিদ্যমান (অবরোধের অর্থ হলো বিভিন্ন প্রজাতির সদস্যবৃন্দ পরস্পরের সঙ্গে প্রজননে অক্ষম), এই জীন প্রযুক্তি সেই অবরোধের অবসান ঘটিয়েছে। পরাগ মিলন বা সংকর পদ্ধতিতে যে জীন এক প্রজাতি থেকে অন্য এক প্রজাতিতে স্থাপন অসম্ভব, এই প্রযুক্তি কৃত্রিমভাবে, প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে এক প্রজাতির জীন অন্য প্রজাতিতে সংস্থাপন করে। এই প্রযুক্তির লক্ষ্য হলো তিলোত্তমা নির্মাণ, সুকুমার রায়-এর 'হযবরল'-এর মতো বেড়ালকে চশমায় রূপান্তরকরণ।

লেখক বার্নাড একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন— একবার এক রূপসী মহিলা তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বলেন যে বার্নাড যদি ঐ মহিলাকে বিবাহ করেন, তবে তাঁদের পুত্র-কন্যাগণ বার্নাড-এর ধীশক্তি এবং ভদ্রমহিলার রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে! বার্নাড শ মহিলাকে জানান যে উল্টো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও প্রায় সমান সমান। অতএব ঐ পরীক্ষায় সফল হওয়া মোটেই নিশ্চিত নয়। জীন-প্রযুক্তির জন্যও এই যুক্তি প্রযোজ্য।

প্রাকৃতিক পরীক্ষায় এক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ায় এই নির্বাচনের কাজটি ঘটে নিরপেক্ষভাবে। একটি সফল, পরীক্ষালব্ধ প্রবণতা পরের প্রজন্মে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা যতই চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করুন না কেন, তাঁরা এখনও প্রকৃতির পরিচালিত পরীক্ষাপদ্ধতির সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি। তাই আমরা জানি না এই যে সমস্ত 'হাঁসজারু'-বৃন্দ (যেমন জোনাকি-তামাক, বেগুনি ক্যাপসিকাম) বিজ্ঞানীরা নির্মাণ করেছেন, তাদেরকে প্রকৃতি অতীতে

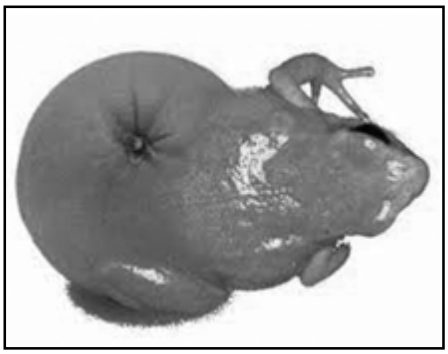

কোনও এক সময় নির্মাণ করে অযোগ্য বিবেচনায় পরিত্যাগ করেছে কিনা। যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে এই সমস্ত 'হাঁসজারু'দের অবয়ব নির্মিত, তাদের মৃতদেহ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে জীবাশ্মে রূপান্তরিত হতে পারে না। তারা পচে গিয়ে মাটিতে মিশে যায়। আমাদের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের জন্য তাই তারা কোনও জীবাশ্ম অবশেষ রেখে যেতে পারেনি।

জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে পেরেছি অবয়ব এবং অন্যান্য কী প্রাণরাসায়নিক বিষয়ে ঘাটতি থাকার কারণে ডাইনোসর, লম্বা দাঁতওয়ালা বাঘ, ইত্যাদি প্রাণিবৃন্দ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অযোগ্য বিবেচনায় পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যে কারণে প্রাচীন প্রাণিবৃন্দ একদা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই কারণগুলোর অনেক-ক'টাই আজকের এই বিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্মিত 'অর্বাচীন' জীন-প্রযুক্তিজাত প্রাণীদের জন্যও একই রকম সত্যি। জীন-প্রযুক্তিজাত খাদ্যের উৎপাদন আসলে 'ধর্ষণের মাধ্যমে শুক্রের প্রসার', দ্রুত, হিংস্র এবং বেহিসেবি। প্রকৃতি এদের অনুমোদন দেয়নি।

আধুনিক আণবিক জীব-বিজ্ঞান দ্বিতীয় একটি যুক্তি হাজির করেছে। এতদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিলো একটি জীন, সেই প্রাণীর সমগ্র জীন সমষ্টিতে অবস্থান করে একটি মাত্র কাজ সম্পাদন করে। আধুনিক জৈব-প্রযুক্তির মূল প্রকল্পও এই ধারণাটিই। জীন-প্রযুক্তিবিদদের মত হলো খানিকটা এই রকম : যদি কোনও প্রজাতির মধ্যে একটি ধর্ম লক্ষ্য করে (যেমন ধরা যাক জোনাকি পোকার মিটামিটে আলো ছাড়ার ধর্ম) সেই ধর্মটির জন্য দায়ী জীনটিকে (জোনাকির জন্য যেমন লুসিফেরিন জীন) শনাক্ত করতে পারি, তবে আমরা সেই জীনটিকে বিচ্ছিন্ন করে কৃত্রিম পদ্ধতিতে আমরা তাকে অন্য প্রাণীর জীন-সমষ্টিতে (যেমন তামাক গাছে) সংস্থাপন করতে পারি। এই পদ্ধতিই হলো জৈব-প্রযুক্তি। এই ঐ সংস্থাপিত জীনটি, অন্য প্রাণীর জীন-সমষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়ে তার ধর্ম বজায় রেখে একই কাজ (জোনাকি-তামাকের ক্ষেত্রে তামাকগাছ থেকে জোনাকির আলো নির্গমন) করবে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে জীব-প্রযুক্তিবিদরা মাটিতে বসবাসকারী একটি অবজীব (যা মোটেই গাছ-জাতীয় নয়, প্রাণী-জাতীয়)-এর কিছু কিছু রোগ-নিরোধক জীন, যা 'বিটি জিন' নামে এখন পরিচিত হয়ে উঠেছে, সেটিকে প্রাকৃতিকভাবে লভ্য তুলোর জীনসমষ্টিতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের অনুমান যে অণুজীবের জীন সমষ্টিতে অবস্থান করে এই জীনটি যেহেতু কিছু কিছু রোগ-নিরোধক প্রবণতা দেখায়, তুলোর জীন সমষ্টিতে অবস্থান করেও এই জীনটি তখন তুলোকে ঐ সমস্ত রোগের বিরুদ্ধে আপনা থেকেই প্রতিরোধী করে তুলবে। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে একটি জীব, তার নিজস্ব জীব-সমষ্টিতে অবস্থান করে যে কাজটি সম্পাদন করে, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জীন-সমষ্টিতে অবস্থান করেও সেই জীনটিই নিরপেক্ষভাবে সেই একই কাজ অন্য প্রজাতির জন্যও চিরকাল সম্পন্ন করে চলবে।

আণবিক জীন-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আজকে আমরা এক কোষী প্রাণী, নানা গাছ থেকে শুরু করে কিছু কিছু বহুকোষী প্রাণী, এমনকি মানুষের পর্যন্ত সমগ্র জীন-সমষ্টি জানতে সক্ষম

হয়েছি। গত এক দশক ধরে সেই বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে 'একটি জীন একটি মাত্র কাজ করে' এবং 'একটি জীন জীন-সমষ্টি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে'— এই দুই অনুমান মূলত ভ্রান্ত। অল্প কয়েকটি বিশেষ অবস্থায়, অল্প কয়েকটি বিশেষ জীন-এর জন্যই মাত্র এই অনুমান প্রায় খেটে যায়।

'একটি জীনের একটি কাজ' এই ধারণাটা যদি ঠিক হতো তবে মানুষের জীন-সমষ্টিতে যতগুলি জীন থাকার কথা (অর্থাৎ মানুষের দৈনন্দিন জৈবিক কাজ কর্ম চালানোর জন্য) ছিলো ('একটি জীন, একটি কাজ' এই হিসেবে) মানুষের সমগ্র জীন-সমষ্টিতে রয়েছে তার অর্ধেকেরও কম জীন! অন্যান্য যে সব প্রাণীর সমগ্র জীন-সমষ্টি এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পেরেছি, তাদের প্রত্যেকের জন্যই দেখা যাচ্ছে যে 'একটি কাজ, একটি জীন' হিসেবে তাদের জীন-সমষ্টিতে যে কটা জীন থাকার কথা তার চেয়ে ঢের কম পরিমাণে জীন তাদের জীন-সমষ্টিতে রয়েছে। তাই জৈব-প্রযুক্তিকে যে মূল অনুমানের ভিত্তিতে চালানো হচ্ছে, সেটি পরীক্ষা দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেছে। দেখা গেছে একটি জীন, প্রাণীর জীন-সমষ্টির বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান থেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। অর্থাৎ একটি জীন, জীন-সমষ্টিতে যে কোনও স্থানে অবস্থান করে সারা জীবন একই কাজ করবে এমন ধারণা ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত, জীনটি ঠিক কী পরিমাণে একটি কাজ সম্পাদন করবে, তা নির্ভর করে তার আশপাশের অন্যান্য কিছু বিশেষ জীনের উপস্থিতির ওপর। একটি জীনের কর্মদক্ষতা অন্যান্য কিছু বিশেষ জীনের ছন্দোবদ্ধ কাজের ওপর নির্ভরশীল। এ যেন এক চমৎকার সম্মেলক নৃত্য— একজন নৃত্যশিল্পে বেতাল হলে সমগ্র নৃত্যটির ছন্দপতন অনিবার্য।

হয়ত বা একারণেই বিটি তুলোতে বিটি জীনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটা দুটো প্রজন্মে মোটামুটি ভালো কাজ করলেও তারপর এই প্রতিরোধ ক্ষমতা মূলত ব্যর্থ হতে শুরু করে। বিটি-জীন তুলোর অচেনা জীনসমষ্টির মধ্যে পড়ে হাঁপিয়ে ওঠে। তার রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক ক্ষমতা যায় হারিয়ে। তার নাচন শুরু হয় তুলোর জন্য বেতালা ছন্দে, ফলে তুলোর জন্ম-বৃদ্ধি-বিবাহ-মৃত্যুর এই শৃঙ্খলবদ্ধ আবর্তনটি হয়ে পড়ে তালকানা। উৎপাদনও তাই আস্তে আস্তে কমে আসে। এমনকি প্রাকৃতিক তুলোর প্রকৃতিগত যে নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল, এই বেতালা নৃত্যের পাল্লায় পড়ে সেটাও যায় নষ্ট হয়ে। রোগাক্রান্ত হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে তুলোর বীজ মরে যায়, কেউ কেউ আবার বাঁজা হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা আরও একটি তৃতীয় বিষয় নজর করেছেন। যে পরক জীনটি তাঁরা জীন-প্রযুক্তি প্রয়োগ করে অন্য একটি প্রজাতির জীন-সমষ্টিতে সংস্থাপিত করেছেন, সেই পরক জীনটির জন্য

প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা কিন্তু বাকি জীন-সমষ্টির থেকে শুধু ভিন্ন তাই নয়, তার প্রয়োজনও অপেক্ষাকৃত বেশী। এই সব নানান কারণে জীন পরিবর্তিত খাদ্যের উৎপাদন করতে লাগে প্রচুর পরিমাণে জল, নানা জাতের প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক সার, প্রচুর কীটনাশক এবং প্রচুর পরিচর্যা। কীটনাশক যে শুধু অন্যান্য কীট নাশ করতে কাজে লাগ তাই নয়, অনেক সময় এক বিশেষ জাতের কীটনাশক লাগে ঐ পরক জীনটিকে সক্রিয় করতে। উদাহরণ হিসেবে আমরা মনস্যান্টো সংস্থার রাউন্ড-আপরেডি কীটনাশক-এর কথা বলতে পারি, যা বিক্রি করা জৈবপ্রযুক্তিজাত বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি পরক জীনকে সক্রিয় করতে প্রয়োজন হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা সুমো কুস্তিগিরদের উদাহরণ টানতে পারি। সুমো কুস্তিগিরদের ঐ প্রকান্ড চেহারা বানাতে খেতে হয় বিশেষ খাদ্য, পাশাপাশি লাগে বিশেষ ব্যায়াম এবং প্রচুর বিশ্রাম। এসবের জন্য তাদের দেহে মেদ বাড়ে দ্রুত, কিন্তু তারা সুমো কুস্তি ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না স্রেফ চেহারার কারণেই। সুমো কুস্তিগির হিসেবেও তাদের জীবনকাল সীমিত— তারা বড়জোর পাঁচ সাত বছর কুস্তিগির হিসেবে টিকে থাকতে পারে। জৈব-প্রযুক্তিজাত প্রাণীদের তাই সুমো কুস্তিগিরদের বন্সাই সংক্ষরণ বলা যেতে পারে।

লাভ-ক্ষতির কিস্সা

তুলো, ফুল বা তামাকে জীন-প্রযুক্তি খাটিয়ে জীন পরিবর্তিত প্রাণীর নাম করে হাঁসজারু বানালে তা চাষীদের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনলেও তাতে আমরা চাকরি করা মাস মাইনের মানুষরা খুব একটা প্রভাবিত হই না। কিন্তু আমাদের রোজকার খাদ্য চাল, ডাল, গম, ভুট্টা বা বেগুন, আলু, পটল, মুলো যদি এমন হাঁসজারু হয়ে ওঠে, তখন আমাদের একটু নড়েচড়ে না বসে উপায় নেই।

ভারতের বাজারে এখনই জীন-পরিবর্তিত ভুট্টা, বেশ কিছু ধরনের ধান এবং গম-এর আমদানি ক্রমাগত বাড়ছে। বিভিন্ন মেলায় বিক্রি হওয়া পপকর্ন, হোটেলের মেনুর বেবি কর্ন যা দেখি, তার বড় অংশটাই চীন থেকে আমদানি করা জীন পরিবর্তিত করা ভুট্টা। 'কর্ন সিরাপ' তো বহুকালই প্রায় একচেটিয়াভাবে জীন-প্রযুক্তিজাত ভুট্টা থেকেই তৈরি হচ্ছে। চিকিৎসকদের মত হলো বাচ্চাদের মধ্যে মোটা হওয়ার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার জন্য এই জীন-পরিবর্তিত ভুট্টার অবদান রয়েছে। মানুষের শিরায় অতিরিক্ত চর্বি জমা, রক্তচাপ বাড়া ইত্যাদি বৈকল্যের জন্য জীন- পরিবর্তিত ভুট্টার প্রভাব রয়েছে। জীন-পরিবর্তিত খাদ্যগ্রহণের ফলে দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা মোটেই অমূলক নয়।

বিটি-জীনযুক্ত জীন-পরিবর্তিত খাদ্য সত্যিই মানুষের শরীরে কোনও প্রভাব ফেলে কিনা তা দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে ইঁদুরকে বিটি-আলু খাইয়ে পরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে ক্রমাগত বিটি-আলু খাওয়ার ফলে ইঁদুরদের যকৃতের ব্যামো হয়, তাদের মধ্যে ক্যানসার রোগ হওয়ার প্রবণতা বাড়ে। ইঁদুরের জীনসমষ্টির গঠন মানুষের সমতুল্য হওয়ায় মানুষেরও ঐসব ক্ষতি

হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। এই সমস্ত নানা কারণে সারা পৃথিবীর মানুষ বিটি-জীন খাদ্য (যেমন আলু বা বেগুন) বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছেন। ভারতের জনগণ তৎকালীন পরিবেশমন্ত্রী শ্রী জয়রাম রমেশকে জুতো এবং বেগুনের মালা পরিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা জীন-পরিবর্তিত বিটি-বেগুনের বিরোধী।

উত্তর কথা :

খাদ্য নিয়ে মানব জাতির চিন্তার শেষ নেই। সন্তান-সন্ততিকে দুধেভাতে রাখার জন্য বাবা-মার উদ্যোগকে পুঁজি করে একদল মানুষ খাদ্য ব্যবসায় লিপ্ত। খাদ্য হয়ে উঠেছে মুনাফাযোগ্য পণ্য। উত্তরকথা তাই শুরু করতে হবে পূর্বরাগ যেখানে শেষ হয়েছিলো, ইউরোপের জাতিগুলোর পীতক্ষুধার সেই কাহিনীর সূত্র ধরে।

আধুনিক কালে মার্কিন দেশের এক বিখ্যাত কূটনীতিক হেনরি কিসিংগার ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন দেশ নাস্তানাবুদ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে একবার মন্তব্য করেছিলেন যে পৃথিবীর যে রাষ্ট্র খাদ্যের আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং বিভিন্ন দেশে খাদ্য দিয়ে 'সাহায্য' করার মতো অবস্থায় থাকবে, তারা সেই সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্ত দেশগুলোর বিদ্রোহী মানুষগুলোকেও বশ করতে পারবে। যতদিন সাবেকি কৃষি পদ্ধতি চলে আসছিল ততদিন সাবেকি কৃষকদের হাতে তাদের নিজেদের ফসলের বীজের নিয়ন্ত্রণ ছিলো। কিন্তু যেই প্রথম 'সবুজ বিপ্লব'-এর হাত ধরে উচ্চ ফলনশীল বীজ হাজির হলো ঠিক তখন থেকেই সাবেকি কৃষকের হাত থেকে বীজের নিয়ন্ত্রণ একটু একটু করে উৎপাদন সংস্থাগুলোর হাতে নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করলো। আর যখন সেই বাজারে জীব-প্রযুক্তি বীজ এসে গেলো, তখনই এই বীজগুলো সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণের এক বিপদ সংকেত নিয়ে উপস্থিত হলো।

গল্পকথা বা বিজ্ঞান বিরোধীদের এটা মোটেই প্রচার নয় যে খাদ্য উৎপাদনের নিরিখে মার্কিন দেশ ও পশ্চিম ইউরোপ পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মাত্র ৫-৭ শতাংশ উৎপাদন করে, যদিও তারা পৃথিবীর খাদ্য আমদানি-রপ্তানি বাজারের ৯৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। তারাই বিশ্বের বাজারে খাদ্য বেচা কেনার দাম নির্ধারণ করে। যে কটা সংস্থা, যেমন মনস্যান্টো, কারগিল, এলি লিলি, প্রভৃতি যারা খাদ্য শস্য ব্যবসার বড় অংশটাই নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই আবার জৈব-প্রযুক্তি কোম্পানি হওয়ার সুবাদে বীজের বাজারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রক।

এই কোম্পানীগুলো আমাদের মতো দেশগুলোর কর্তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে সফল হয়েছে যে সমাজের মতো দেশগুলোর খাদ্য সমস্যার 'সমাধান' লুকিয়ে রয়েছে জীন-পরিবর্তিত খাদ্যের মধ্যেই। সরকারও তার নাগরিকদের বোঝাতে চাইছে যে দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধান হলো আমদানি করা মহার্ঘ বীজের সাহায্যে উৎপন্ন ভিটামিন এ-সমৃদ্ধ চাল যা জীন-প্রযুক্তি প্রয়োগ করে নির্মিত হয়েছে। অথবা বিটি-বেগুন বা বিটি-ভুট্টা। কর্তাদের প্রত্যক্ষ মদতে সারা পৃথিবীর কৃষিকাজকে এখন মনস্যান্টোর বীজ, খনিজ তেল সংস্থাগুলোর রাসায়নিক সার, ভৌমজল উত্তোলনের জন্য ডিজেল পাম্পনির্ভর করে তুলতে হবে। অবশ্য এর ফলে দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদন বাড়বেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

খোদ মার্কিন দেশ-সহ পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষ এই অনাচারের বিরুদ্ধে এককাট্টা। জীব-বৈচিত্র্যের দিকে নজর রেখেই, বেগুনের বিষয়ে সবচেয়ে বিপুল বৈচিত্র্য-সম্পন্ন দেশ ভারতকে মনস্যান্টো সংস্থা তার অপ্রমাণিত বিটি-বেগুন প্রযুক্তির গবেষণাগার হিসেবে বেছে নিয়েছে। এর আগে ভারতের বাসমতী চালের সুগন্ধের জন্য দায়ী সুগন্ধ-জীনটিকে হটিয়ে দিয়ে মার্কিন দেশ বানিয়েছিল ট্যাক্সমতী— বাসমতীর সুগন্ধ সাহেবরা সইতে পারতো না বলে। থাইল্যাণ্ডের উচ্চমানের রূপমতী (বাসমতীর মাসতুতো বোন বলা যেতে পারে) চালকে হটিয়ে গন্ধহীন ট্যাক্সমতী চালানোর প্রচেষ্টা আপাতত ব্যর্থ হলেও প্রচেষ্টা সমানে জারি আছে।

সে আলাদিনের জিনকে ইউরোপ আর মার্কিন দেশের সাম্রাজ্যতন্ত্র কয়েক শতাব্দী আগে বোতল থেকে মুক্তি দিয়েছিল, সেই জিনটি আজকে জীন-প্রযুক্তির রূপ নিয়ে এক ভয়াবহ সর্বনাশের পথে মানবজাতির দীর্ঘকালীন অনুশীলনের ফলে পরীক্ষিত কৃষিকাজকে হটিয়ে দিতে চাইছে। যদি তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হয় তবে তা মানবজাতির পক্ষে ঘোর দুর্দিন সন্দেহ নেই।

লেখক পরিচিতি : ড. শুভাশিস মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীব-পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।

advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রপ্তিস্থান :

বই-চিত্র (কফি হাউসের তিনতলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রিট), ডি আর সি এস সি ঢাকুরিয়া অফিস (দক্ষিণাপণ- এর উল্টোদিকে)। অম্লান দত্ত বুকস্টোর, বিধাননগর পৌরসভা— এফ ডি ৪১৫/এ। দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট।

যোগযোগ : ই-মেল- utsamanush 1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

ল্যাংড়া পাঁচুর জীবনদর্শন

আশীষ কুমার কুণ্ডু

পাঁচু হেঁটে চলেছে গটগটিয়ে— একেবারে মিলিটারী স্টাইলে— এক, দো, এক। যেমন শিখেছে হাসপাতালে। পাশে তার ভাই। ভাইয়ের হাতে পাঁচুর ক্রাচজোড়া আর একটা বড়সড় প্যাকেট। সিঙ্গাড়া, মিষ্টি আরো কত কি। পাঁচু হাসপাতাল থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছে। বি.টি. রোড থেকে বাসে ব্যারাকপুর। তারপর ট্রেনে জগদ্দল। ব্যারাকপুর স্টেশনে দুই ভাইয়ের প্যাকেটখানার সদ্‌গতি করার মতলব।

শরৎকালের আকাশ। রোদ ঝলমলে। আহা সোনা রোদ। পাঁচুর মনটাই ঝলমল করছে। ওই একটু রাস্তা— তারপরই বি.টি. রোড।

ঘাড়ে একটা পোকা বসেছে। কাঁচ পোকা। ভাই চাপড় মারতে যাচ্ছিল, আহা করিস কি? সাবধানে ধরে পাঁচু পোকাটাকে এক গাছের ডালে বসিয়ে দিল। আহা, কেষ্টর জীব।

বাচ্চারা লাফাতে লাফাতে স্কুল থেকে ফিরছে। ঘাড়ে পড়ে আর কি! ধমকে ওঠার বদলে পাঁচু একটা বাচ্চার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। বাচ্চারা হুল্লোড় তো করবেই।

বি.টি. রোডটা পেরোতে গিয়েই ঘটনাটা ঘটল। একটা ৪০৭ আসছিল উলটো দিক থেকে। ভেবেছিলো পেরিয়ে যাবে। ভাই পৌঁছে গেল ওপারে। পাঁচু পারল না।

''গেল গেল'' চিৎকার। আশেপাশের লোক দৌড়ে আসার আগেই ৪০৭— কলকাতার যম, পাঁচুকে পিষে দিয়ে পালিয়ে গেল।

* * *

পাঁচুর নামমাহাত্ম্য

পাঁচু জন্মেছিল পঞ্চানন দাস। বাবা শ্রী নারায়ণ দাস। ঘরামীর কাজ করেন। গলায় কণ্ঠী। অবসর সময়ে কীর্তনের দলে। বাড়ী জগদ্দল। মায়ের নাম বলতে নেই। বাবুদের বাড়ীতে কাজ করার সময় নাম হয়েছিল ''পাঁচুর মা''। পাঁচু কর্মক্ষম হওয়ার পর অন্যের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েছেন।

গোঁফ বেরোনোর আগেই পাঁচু ''বান্ডা পাঁচু'' হয়ে গেল। সে এক গপপো বটে। তখন জগদ্দলে অনেক খেজুর গাছ। গরীবগুর্বোর ঘরেও। ইজারা নেওয়া থাকতো। ভোররাতে রসের ব্যাপারীরা এসে সেই রস পাড়তো। পাঁচু আর তার দলবল সন্ধ্যের আগেই বেরিয়ে পড়তো রসের টানে। পাঁচুই নেতা। গুলতিতে সে অর্জুন। তখন সে কত— বছর বারো। ক্লাস ফাইভ ফেল করে স্কুল ছেড়েছে। গুলতি দিয়ে হাঁড়ি ফাটিয়ে নিচে দাঁড়িয়ে আঁজলা পেতে রস। ক'দিন ভালই চলল। ব্যাপারীরা তক্কেতক্কে ছিল। একদিন ধরে ফেলল। পাঁচুকে খেজুর গাছেই বেঁধে আচ্ছা করে পিটল। জগদ্দলে হইরই। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধে আর কি!

রস অধ্যায় শেষ হল। তবে পাঁচু আর পাঁচু রইল না। হয়ে গেল ''ভান্ডা ফোঁড় পাঁচু''। সেখান থেকে ''ভান্ডা পাঁচু''। অতঃপর ''বান্ডা পাঁচু''। প্রায় সবাই ভুলে গেল পাঁচু কেন ''বান্ডা পাঁচু''— কিন্তু নামটা রইল।

কিছুদিন বাপের সাথে জোগাড়ের কাজ করে আর পোষাল না। এক বন্ধুর হাত ধরে ট্রেনের হকারী। টিপ বোতাম, কান খুঁচুনী, স্কচ ব্রাইট— এই আর কি! সুবিধে আছে— বিক্রী না হলে বাদাম ভুজিয়ার মত নষ্ট হয়ে যায় না। লাভ ভালই। শান্তিপুর লোকালের ডেলি প্যাসেঞ্জাররা ডাকে বান্ডা বলেই।

কারণ হকারদের মধ্যে আরেক পাঁচু আছে। বাওলা পাঁচু। চা বেচে। খুব বাওয়ালী করে। লোকে বলে চা বেচে না কথা বেচে। তা শান্তিপুর লোকালে দুই পাঁচু— বান্ডা আর বাওলা।

ভালই চলছিল। কেলেঙ্কারিটা হল— ট্রেনে নয় বাসে। অবরোধে ট্রেন আটকা। রাত হয়ে আসছে। অগত্যা বাসে করে বাড়ি। বড্ড ভীড়। বাঁ হাতে দোকান। ডান হাতে বাসের রড ধরে সামনের পাদানীতে পা। ঠিক হড়কে গেল। পেছনের চাকায় ডান পাটা চলে গেল। মাস দুয়েক পরে হাসপাতাল থেকে যখন বেরোল তখন পাঁচুর হাঁটুর তলায় ডান পাটা নেই। পাড়ার এক ক্লাবের দৌলতে একজোড়া ক্রাচ। কি বাহারী নাম— বৈশাখী। আর বান্ডা পাঁচু হয়ে গেল ''ল্যাংড়া পাঁচু''!

সব ঠিকই ছিল। ক্রাচে সে এমন চটপট চলাফেরা করে, অন্য লোক পাল্লা দিতে পারবে না। তবে পাটা মাঝে মাঝে বড় টাটায়— যেটা নেই সেটাই। হাত বোলাতে গিয়ে দেখে পাটা নেই।

আর ঝামেলা হল ট্রেনের ব্যবসায়। হাতে দোকান নিয়ে, ক্রাচ নিয়ে ট্রেনে ওঠাই যায় না। তবে লোকে ধরে-টরে দেয়।

তা এখন পাঁচু ''ফটার'' লাগায়। কোন ওজন নেই। প্লাস্টিক সিট, মোমবাতি, দেশলাই পাকেটেই চুকে যায়। ট্রেনে উঠেই ''ফটারটা লাগাবেন''। এক বাবু একদিন বললেন— ''ওরে পাঁচু, ওটা ফটার নয়— প্রোটেক্টার— ঘড়ির প্রোটেক্টার।'' তা চলতি নাম না বললে চলবে কেন।

মুস্কিল হয়েছে ঘড়িতে আজকাল আর খুব কেউ ফটার লাগাতে চায় না। আগেকার বাবুরা এখনো সামনে ''বান্ডা'' বলে। আড়ালে আবডালে ল্যাংড়া।

ট্রেনে বাবুদের একজনই খবর দিল। বেলঘরিয়ায় নেমে অটো করে চলে যা। বড় সরকারি হাসপাতাল। বিনে পয়সায় সুন্দর পা বানিয়ে দেবে। গটগট করে হাঁটবি।

হাঁটি হাঁটি পা পা

হাসপাতালে হইচই। চুনকাম ঝাড়পোঁচ। পুনর্বাসনের হাসপাতাল। দিল্লী থেকে মন্ত্রী আসবেন পরিদর্শনে। সব বিছানায় নতুন চাদর। সিস্টাররা চেয়ার ছেড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাস ছয়েক আগেও মন্ত্রী আসার কথা ছিল। তখন একবার চুনকাম হয়েছে। দিল্লী থেকে কেউ হোমড়া চোমড়া আসার কথা হলেই সব মাকড়সার জাল পরিষ্কার। তবে ছ'মাসে দুবার রং?

সমস্যা হল সিঁড়ির কোণায় কোণায় লাল ছোপ। পানের পিচ। কে ফেলে— কর্মচারী না রুগী? পান ত' অনেকেই খায়। হাসপাতালের অধিকর্তা মহাশয় লোক লাগিয়ে, নিজে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও ধরতে পারেননি, তাই এবার অনেক মাথা ঘামিয়ে সমাধান বার করেছেন। পানের পিচের রং-এর টাইলস— প্রতিটা সিঁড়ির কোণায় কোণায়।

এহেন কর্মযজ্ঞের মধ্যে পাঁচু এসে হাজির। হকচকিয়ে গেল। পেল্লায় সব ঘরবাড়ী। পায়ে পায়ে রুগী। কত কত হাত কাটা পা কাটা লোক। এদিক ওদিক ঠোক্কর খেয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিক জায়গায়।

প্রথম দফায়—

"হবে। পা হবে। একটা ফটো আর একটা মাসিক আয়ের সার্টিফিকেট লাগবে।"

"আমার তো সেরকম আয় নেই বাবু। দিন আনি, দিন খাই।"

"তা বললে তো হবে না।" মাসিক আয় পাঁচ হাজারের কম* হলে বিনা পয়সায় পা হবে।

দ্বিতীয় দফায়—

"না, পঞ্চায়েত-প্রধানের সার্টিফিকেটে হবে না। অন্তত বিডিও। আর কোনো আয় নেই বললে তো হবে না। দু চার হাজার কিছু লিখতে হবে।"

তৃতীয় দফায়—

পায়ের মাপ হল। এবার পনেরো দিন পরে এসে খোঁজ নেওয়া। তা পাঁচুর ভাগ্য ভাল। অধিকর্তা মশায়ের চোখে পড়ে গেল। পাঁচদিন পরে মন্ত্রীমশায় আসবেন। নিজে হাতে হুইল চেয়ার, কৃত্রিম পা দেবেন। কিছু শক্ত-সমর্থ চালাক-চতুর রুগী চাই।

রাতারাতি পা রেডী। পরের দিন থেকে পাঁচুর ট্রায়াল শুরু। গট গট হাঁটা। "এক দো এক", তারপর ফিনিশিং, তারপর মন্ত্রীমশাই।

"তুম্‌হারা নয়া জীবন। এই পা লিয়ে হাঁটবে। দেশের ভালা করবে।"

একমুখ উজ্জ্বল হাসি নিয়ে পাঁচু হেঁটে বেরোল। হাতে মিষ্টির প্যাকেট, পাশে ক্রাচ হাতে ভাই।

এবার পাঁচু বাড়ি যা

নাঃ পাঁচু বেঁচে গেল। ৪০৭ তার নকল পায়ের ওপর দিয়েই গেছে। পা ভেঙ্গে চুরচুর। আর কোথাও আঁচড়ও লাগেনি। প্রাণে বেঁচেও মন খারাপ।

ভাঙ্গা পা বগলে নিয়ে পাঁচু ফিরে চললো— হাসপাতালে।

না মন্ত্রীমশাই চলে গেছেন দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে। অধিকর্তামশাই সঙ্গে গেছেন।

এ দফায়—

"না না আর পা হবে না। সরকারি নিয়ম। দু বছরের আগে আর বিনা পয়সায় পা পাবে না।"

ফিরছে পাঁচু। রোদের বড্ড তেজ। গা চিড়বিড় করছে। চটাং করে চাঁটি মেরে পাঁচু ঘাড়ে একটা পোকা মারল। কাঁচপোকা। দৌড়ে আসা এক বাচ্চাকে এক ধমক।

মিষ্টির প্যাকেটটা নেতিয়ে গেছে।

* সরকারের ADIP Scheme-এ সারা দেশেই এভাবে কৃত্রিম হাত-পা পাওয়া যায়। ২০০৫ সাল থেকে মাসিক আয় সাড়ে ছ' হাজারের কম হলে বিনা পয়সায়, আগে ছিল পাঁচ হাজার।

With Best Wishes from

Cosme Farma
Laboratories Limited

রাগ

মন্দাক্রান্তা সেন

গল্পটা আমার বন্ধু আশা-র।

বললাম বটে আশা, কিন্তু আশা বললে ও ভয়ানক চটে যেত। আসলে ওর পুরো নামটা ভারি সুন্দর। আশাবরী, সকালের একটি রাগিনী। ও রেগে বলত— আশাবরী এমন কিছু কঠিন নাম নয়, পুরো নামটা ধরে ডাকতে এমন কি অসুবিধে রে তোদের! আশা খারাপ নাম আমি বলছি না, কিন্তু আশা আর আশাবরীতে অনেক তফাৎ। যেমন ইমন আর ইমলিতে। তখনও বুঝিনি এই ক্রোধ আশাবরী পেয়েছে ওর মায়ের কাছ থেকে। উত্তরাধিকারসূত্রে।

পরে আমি এও জানলাম আশাবরীর রাগী মা গানপাগল। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিখেছেন নাড়া বেঁধে, যথেষ্ট দখলও অর্জন করেছেন, কিন্তু বাইরে কোথাও গান না। গানের প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ তাঁর দুই ছেলেমেয়ের নামে— আশাবরী আর ইমন। আমি আশাবরীর বাড়িতে কয়েক রাত থেকেছি— কখনও পড়াশুনোর কারণে, কখনও এমনিই আড্ডা মারতে মারতে রাত হয়ে যাওয়ায়। মাঝরাতে শুনেছি আশাবরীর মা-ও ঘুমোননি, গুনগুন করে কী এক অপূর্ব সুরে আলাপ করছেন। আশাকে জিজ্ঞেস করাতে ও বলল রাগটার নাম জয়জয়ন্তী। তার মায়ের প্রিয় রাগ। তারপর অল্প হেসে বলল— মা বলেছে, আমার এক ছেলে এক মেয়ে হবে। তাদের নাম রাখবে জয় আর জয়ন্তী।

আশাবরীর সন্তান হলো। আমরা তখন কলেজে। আশার সাথে বন্ধুত্বের গাঢ়ত্ব অনেক স্তিমিত হয়ে এসেছে। একে তো দু'জনের কলেজ আলাদা, স্ট্রিম আলাদা— আমার সায়েন্স ওর আর্টস। দু'জনের নতুন নতুন অনেক বন্ধু। তবু আশার সঙ্গে আলগা যোগাযোগটা ছিলই। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি ভেতরে ভেতরে শেখরের সঙ্গে এতটা এগিয়েছে! শেখর ওর মাসতুতো দাদার বন্ধু। ওদের প্রেমের ব্যাপারটাই আমার জানা ছিল। ছেলেটি আশার মাসিক বন্ধ হতেই পিঠটান দিয়েছে। আশার নামে অনেক বদনাম দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য শক্ত মেয়ে আশাবরী। হয়তো এও তার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া জেদ। বাড়িতে, বাইরে, সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা এমনকি টিটকিরি মারধোর সহ্য করে নিজে নিজে ম্যাটারনিটি হোমে গিয়ে বাচ্চা নামাল। যমজ বাচ্চা। জয় আর জয়ন্তী। তার মায়ের আশা। আশার মায়ের অভিলাষ। আশার মায়ের ক্রোধ, তাঁর রাগ! আশা তার রাগী মায়ের বাড়ি ছেড়ে তাঁর প্রিয় দুটি রাগ নিয়ে চলে এসেছিল। একটা মেয়েদের হোস্টেলে থাকত। পড়াশোনা ছেড়ে দিলো। কোথায় রিসেপশনিস্টের চাকরি নিল একটা। বাচ্চাদুটোকে রেখে এল পিসিমণির বাড়ি। পিসিমণি আশাবরীকে ভালোবাসেন। মুখে যথেষ্ট গালাগালি দিলেও বাধ্য হয়ে বাচ্চাদুটিকে আপন করে নিলেন। হলুদ গোলাপের মতো দুটি বাচ্চা— জয় আর জয়ন্তী। আহা, ওরা তো আর কোনও দোষ করেনি।

আশার সঙ্গে তার প্রাক্তন প্রেমিকবরের কোনও যোগাযোগ নেই। সে আশাকে রাগ উপহার দিয়ে পালিয়েছে। আশার কিন্তু কোনও বিকার নেই। নাড়া বেঁধে গান না শিখলেও মা'কেই সে গুরু মানে, তাঁর কাছে থেকেই তার গান শেখা, মধ্যরাতে মেয়ে-হোস্টেলের বিছানায় বসে সে জয়জয়ন্তী ভাঁজে। খুব আস্তে।

রাত্রের রাগ ধীরে ধীরে গুনগুন করে গাইতেই ভালো লাগে। তার নাম আশাবরী, একটি প্রভাতী রাগ। কিন্তু তার মায়ের মতোই জয়জয়ন্তী তারও প্রিয় রাগ। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া....।

একেকবার সে ভাবে এই হোস্টেল ছেড়ে পিসিমণির বাড়ি চলে যায়। তাহলে বাচ্চাদের সঙ্গে থাকা যাবে। কিন্তু সে স্বনির্ভর থাকতে চায়, স্বাধীন থাকতে চায়। পিসিমণিকে মাসে মাসে টাকা পাঠায় সে। তার চাকরিটা ভালো। তার প্রয়োজন ভালোই মেটে।

এই অবস্থায় আশার জীবনে আবার প্রেম এল। ছেলেটির নাম হিন্দোল। আশার সাথে একদিন দেখা হওয়ায় সে আমায় বলল— দেখিস, হিন্দোলকে আবার আমার মতো ছোট করে হিন্দু বলে ডাকিস না, ও কিন্তু ক্রিশ্চান। পুরো নাম ফ্রান্সিস হিন্দোল দত্ত।

আমি আশাকে বললাম— আশাবরী, আবার?

— কী আবার?

— আবার তুই এসব করছিস? একবারে তোর শিক্ষা হলো না! লোকে কতবার ঠকে শেখে?

— তুই যা ভাবছিস তা নয়। আমি হিন্দোলকে বিয়ে করছি। সেপ্টেম্বরের প্রথম রোববার। গির্জাতে, একবালপুরে। তোর নেমন্তন্ন রইল। মুখেই বললাম। আমি কার্ড আর ছাপাইনি। পিসিমণি আসবে, আর কয়েকজন বন্ধু, হিন্দোলের মা বাবা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। আমি কারও কাছে কিছু লুকোইনি। ওঁরা সব জেনে এই বিয়েতে রাজি হয়েছেন। তবে আমাকে ক্রিশ্চান হতে হবে। আমার কোনও আপত্তি নেই। আমার নাম হয়ে যাবে অ্যাঞ্জেলিনা আশাবরী দত্ত।

আমি জানি ক্রিশ্চানদের বিয়েতেও মেয়ের বাবাই কন্যা সম্প্রদান করেন। এক্ষেত্রে সে প্রশ্নই নেই। আশার পিসেমশাইও মারা গেছেন অনেকদিন। আমি কিন্তু কিন্তু করে বললাম— তোর সম্প্রদান করবে কে?

আশা ফিক্ করে হাসল, কিন্তু তারপর অভিমানী গাঢ় গলায় বলল— আমার তো কেউ নেই, তাই হিন্দোলের জেঠামশাইয়ের এক বন্ধুই আমায় নিয়ে গির্জার আইলে হাঁটবেন। দ্যাখ্, যে নিরুপায়, তার উপায় একটা হয়েই যায়।

ওর বিয়েতে গেলাম। আশাবরীকে সাদা গাউনে সাদা স্বচ্ছ ওড়নায় পরীর মতো লাগছে। হিন্দোল ছিমছাম কোটপ্যান্ট পরা সুদর্শন তরুণ। মনে হলো আশার চাইতে বয়েসে বেশ ছোট। হিন্দোলের জেঠুর বন্ধু যখন অ্যাঞ্জেলিনা আশাবরীর হাত হাতে নিয়ে গির্জার আইলে হাঁটছেন, পিছনে তার গাউনের প্রান্ত ধরে দুটি তিনবছরের হলুদ গোলাপ। জয় আর জয়ন্তী।

বিয়ের মন্ত্র পড়া শেষ হলো। এবার চুম্বন। ওরা কী সুন্দর পরস্পরকে চুমু খেল। তারপর আশাবরী জয়কে কোলে তুলে নিল, হিন্দোল জয়ন্তীকে। এমন সুন্দর দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

আর কখনও দেখবও না।

ওরা জয়জয়ন্তীকে নিয়েই নৈনিতালে মধুচন্দ্রিমা করতে গেল। সাহেবদের মতো বাচ্চাদের রেখে গেল না। আর তারপর, ফিরল না। নৈনিতাল থেকে কৌশানি যাওয়ার পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় চারজনই শেষ। আমি কাঁদতে কাঁদতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম যে— ঠাকুর, ভালো করেছ তুমি সবাইকে এক সাথে তুলে নিয়েছ, কেউ মরল কেউ বেঁচে গেল..... এর চাইতে বড় অভিশাপ আর হয় না।

হিন্দোলদের বাড়ি প্রথমে গিয়েছিলাম। শোকস্তব্ধ আবহাওয়া। তারপর কী মনে হলো, ভাবলাম আশাবরীদের বাড়িতেও একবার যাই।

গেলাম। পাথরের মতো বিষণ্ণ মুখে আশার মা আমাকে তাঁর খাটে বসালেন। কোনও কথা বললেন না। তারপর পাথর গলতে শুরু করল। আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত চেপে ধরে ধরা

গলায় বললাম— মাসিমা!

মাসিমা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন— ওরা আমার সব প্রিয় রাগগুলো নিয়ে চলে গেল রে, সব প্রিয় রাগ নিয়ে চলে গেল.....

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে রইলাম। চিরদিন যাঁর ক্রোধ ও ক্ষুব্ধতার কুখ্যাতি ছিল, সেই নিঃস্ব মাসিমাও আজ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বুকফাটা এ কান্নার কোনও সান্ত্বনা হয় না। আমি চুপ করে বসে রইলাম। আমারও বুক ভেঙে কান্না এসে গেছিল।

অনেকক্ষণ পর মাসিমা বললেন— কেউ জানে না, ওই তিনটি রাগই আমার কত প্রিয় ছিল..... শেষ হয়ে গেল..... আর আমি গাইতে পারব না.... কোনওদিন না.....

তিনটি রাগ?

মাসিমা চোখ মুছলেন, বললেন— আশাবরী, জয়জয়ন্তী, আর.... আর.... হিন্দোল....

আমি চমকে মুখ তুললাম। মাসিমার চোখে কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি। বললেন— আমার ইমনের জন্য একটা মেয়ে খুঁজে দিবি? পূরবী কিংবা বাগেশ্রী?

আমি সেই থেকে মেয়ে খুঁজছি। যদিও আমার খোঁজার কোনও মানে হয় না। ইমন তার নিজের পছন্দের মেয়েকেই বিয়ে করবে, আর তার নাম রাগ দিয়ে নাও হতে পারে। আশার ক্ষেত্রে যেমনটা হয়েছিল।

শুধু মাসিমা আরেকটা রাগ চান, যেটা তিনি সংসারের হাজারো কাজের ভেতর গুনগুন করে আলাপ করতে পারেন।

advt.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয় এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা : ১০০ টাকা (বার্ষিক)
২০০ টাকা (বার্ষিক)
২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

With Best Wishes from

A
Well
Wisher

হাটে বাজারে ডাক্তার মুখার্জি

অংশুমান ভৌমিক

বনফুলের গল্প। তপন সিংহের ছবি। এ যেন রবিশংকর-আলি আকবর যুগলবন্দি! সোনায় সোহাগা! হলে কী হবে 'হাটে বাজারে' ছবিটির কথা অনেকে ভুলে গেছেন। এ সব ছবির প্রিন্ট তো কবেই নষ্ট হয়ে গেছে, নেগেটিভও থাকার কথা নয়। ফলে বড়ো বা ছোটো কোনো পরদায় এ ছবি দেখার উপায় নেই। অথচ ১৯৬৭ সালের ১০ নভেম্বর মিনার-বিজলি- ছবিঘর চেইনে মুক্তি পেয়েছিল 'হাটে বাজারে'। দর্শকদের মন্দ লাগেনি। তাদের একটি অংশ হয়তো অশোককুমার-বৈজয়ন্তীমালাকে দেখতে গিয়েছিলেন। মুম্বাইয়া ঘরানার সিনেমার দুই স্টারকে কীভাবে সামলেছেন তপনবাবু এ কৌতুহল অসঙ্গত নয়। এ ছবিকে স্মরণীয় করে রেখেছে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্রা-বির্ভাব। এর কয়েক বছর আগে পিরানদেলোর নাটক নিয়ে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' প্রযোজনা করেছিল নান্দীকার। দেখতে গিয়ে অজিতেশে মজেছিলেন তপন সিংহ। 'হাটে বাজারে'-র একটি নেতিবাচক চরিত্র দিয়েছিলেন তাঁকে। প্রথম দৃশ্যে ঘোড়ায় চড়ে আগমনের মুহূর্ত থেকেই রুপোলি পরদার দখল নিয়েছিলেন অজিতেশ। নান্দীকারের আর এক নট রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তকেও এ ছবিতে দেখা গিয়েছিল। দর্শক সমাদর তো ছিলই, এ ছবি দেখে সমালোচকরাও উচ্ছ্বসিত ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ছবির রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছিল 'হাটে বাজারে'।

আটের দশকে, নয়ের দশকে দূরদর্শনের একটি চ্যানেলেই যখন টেলিভিশনের সমার্থক, তখন শনিবার-রবিবারের সন্ধ্যায় 'হাটে বাজারে' দেখানো হয়েছে। আমরা যারা সাতষট্টি সালে দেখিনি, তারা দেখেছি। এর বেশি কিছু নয়। ফিল্ম সোসাইটি তপন সিংহকে মোটের ওপর আমল দেয়নি। নয়ের দশকে অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে ফিল্ম স্টাডিজ জাতে উঠেছে। তপন সিংহ এই মহল্লায় কোনোদিনই তেমন কলকে পাননি। ২০০৩-২০০৪-এ তাঁকে নিয়ে কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে বিভিন্ন ফিল্ম ক্লাবের মুখপত্র। ২০০৮-এ তপন সিংহের মৃত্যু। তারপর বেশ কিছু ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়েছে, লেকচার-সেমিনার হয়েছে তাঁকে নিয়ে। এগজিবিশনও হয়েছে। কিছু বইপত্রও বেরিয়েছে। কোথাও 'হাটে বাজারে' নিয়ে বড়ো একটা কথা হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

তবু বাংলা সিনেমায় ডাক্তারদের মুখগুলি মনে করতে গিয়ে 'হাটে বাজারে'-র কথা প্রথমেই মনে এল। ডাক্তারকে নায়ক করে বাংলায় তো কম সিনেমা হয়নি। প্রমথেশ বরুয়া থেকে শুরু সত্যজিৎ রায়, অনেকেই একজন ডাক্তারকে সিনেমার ভরকেন্দ্রে রেখেছেন। পরিচালক নির্ভর বা অট্যুর সিনেমার বাইরে পপুলার সিনেমার যে বিপুল সম্ভার তাতেও ডাক্তার বা ডাক্তারিকে উপজীব্য করে অনেক ফিচার ফিল্ম তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক সাফল্যও পেয়েছে। স্টার সিস্টেমের কুহকের টানে পড়ে আমরা ভুলে যাই যে উত্তমকুমার অভিনীত বেশ কয়েকটি ছবির আধার ডাক্তার বা ডাক্তারি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ভেঙে অজয় করের 'সপ্তপদী' সিনেমাটিকে মধ্যবিত্ত বাঙালি ভোলেননি। এ ছবিতে ব্যবহৃত 'এই পথ যদি না শেষ হয়' সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর সবচাইতে জনপ্রিয় চিত্রগীতি। হেমন্ত-সন্ধ্যার প্লেব্যাকে ভর করে মোটরবাইকে চেপে আঁকাবাঁকা পথে উত্তম-সুচিত্রার হারিয়ে যাওয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ফ্যান্টাসিকে কীভাবে উসকে দিয়েছে এ নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদরা ভাবতে পারেন। উত্তমকুমারে আচ্ছন্ন এই ছবির নায়ক কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের পাশ করা ডাক্তার। ডাক্তার কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি। কালের ফেরে তিনি বর্ণহিন্দুর আবরণ খসিয়ে ফেলে সেবাধর্মে নিয়োজিত খ্রিস্টান মিশনারি হতে পারেন, সপ্তপদীর-র সেলুলয়েড ভার্সানে ডাক্তার বা ডাক্তারির চাইতে প্রণয়সংকট মুখ্য হয়ে উঠতে পারে কিন্তু জনপ্রিয় সংস্কৃতির একটি মাইলফলকে একজন সেবাপরায়ণ ডাক্তারের নায়কত্ব নিরঙ্কুশ থেকেই যায়। সে সব ছবি নিয়ে একে একে আলোচনায় বসা যাবে। উত্তমকুমারের ম্যাটিনি আইডল ইমেজের নির্মাণে ডাক্তারদের সামাজিক অবস্থান কীভাবে অবদান রেখেছে সেদিকেও চোখ রাখব আমরা। হালফিলের বাংলা সিনেমায় ডাক্তারদের দেখতে পাই না কেন এ নিয়ে অরণ্যে রোদনও করা যাবে খানিক। আপাতত মন দেওয়া যাক 'হাটে বাজারে' ছবিটিতে।

তপন সিংহের সিনেমা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা করতে বসে সমালোচক রজত রায় একবার লিখেছিলেন— 'এক আত্মত্যাগী উদারহৃদয় সর্বজনপ্রিয় চিকিৎসকের জীবনকে

কেন্দ্র করে এই ছবির চিত্রনাট্য। অশোককুমার অভিনীত শ্রদ্ধেয় চরিত্রটি মুহূর্তের মধ্যে দর্শকদের মন জয় করে নেয়।' আত্মত্যাগী, উদারহৃদয়, সর্বজনপ্রিয়, শ্রদ্ধেয়— রজতবাবুর দ্যোতক মন্তব্যের এই কয়েকটি শব্দে ডাক্তার কমিউনিটির একটি আদর্শায়িত নির্মাণ আছে। 'হাটে বাজারে' ছবিতে এ নির্মাণ কীভাবে সম্ভব হয়েছিল আমরা বুঝে নিতে পারি।

বনফুলের গল্পের পটভূমি ছিল ভাগলপুর। এ ছবির বারোআনাই আউটডোর লোকেশনে শ্যুট করা। তপন সিংহ যদিও শ্যুটিং করেছিলেন উত্তরবঙ্গে তবু প্রেক্ষাপটে বিহারের ভাগলপুর জেলাই থেকে যাচ্ছে। কোনো জায়গার নাম করেননি তপন সিংহ। তবু দেহাতি মানুষের বেচাকেনার হাট, শ্রমিক-বস্তি, হাসপাতালের হালচাল দেখে একে ভাগলপুর ভাবতে অসুবিধা হয় না।

গল্পটার ভরকেন্দ্র ডাক্তার মুখার্জি। পরিবার বলতে এক রুগ্ন স্ত্রী। নইলে ঘর আর বাহিরের আড়াল নামমাত্র। সারাটা দিনই কাটে রোগী দেখে। সরকারী হাসপাতালে তো বটেই, এর বাইরে হাটেমাঠেমাটে সর্বত্র। দেশসুদ্ধ সবাইকে নামে চেনেন। কল এলেই ছুটে যান রোগীর কাছে। গভীর অবসাদে ডুবে থাকা সম্পন্ন গৃহবধূ থেকে শ্রমিক-বস্তির শিশু— কাউকে ফেরান না। গরিব মানুষদের কাছ থেকে ফিজ নেন না। রোগীদের স্নেহে আর শাসনে বুকের কাছে টেনে আনেন। সুযোগ পেলে বদলে দিতে থাকেন এক-একজনের জীবনের গতিমুখ। মিথ্যে অভিযোগে কাউকে থানায় আটকে রাখা হলে নিজেই থানায় ছোটেন। ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে থাকতে থাকতেই আমরা অনেক মানুষকে চিনতে থাকি। গৃহ-পরিচারক আজব, ড্রাইভার আলি, রগুড়ে বিরিঞ্চিয়া, মোটর মেকানিক অলক থেকে অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ নুটুবিহারী। তবে আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকে বড়োলোকের বকাটে ছেলে লছমনলাল আর স্বামীহারা সবজিওয়ালি ছিপলি। লছমনলাল লম্পট। সে ছিপলিকে ভোগ করতে চায়। ছিপলি সতর্ক থাকে, তফাত রেখে চলে। মাঝে মাঝে বলে, 'হে ভগবান, ক্যা জমানা আ গ্যয়া।'

নিখুঁত চরিত্র চিত্রণ যে তপন সিংহের তুরুপের তাস ছিল এ কথা অনেকেই বলেছেন। অশোক বিশ্বনাথন একবার লিখেছিলেন— 'একটা চরিত্রের অতল গভীরে প্রবেশ করে সেই চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে বার করে আনাই ছিল তপন সিংহের বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্রকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য। .....এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে তিনি এমন এক উচ্চমার্গে নিয়ে গেছেন যার জন্য তাঁকে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটকদের সঙ্গে একাসনে বসাতে হবে।'

কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তপন সিংহের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না। সদ্ভাবও ছিল না। তপন সিংহ এক জায়গায় বলেছেন, 'মানুষের একক সংগ্রামকে প্রাধান্য দিয়ে ছবি করেছি। সত্যি বলতে কী, গোষ্ঠী লড়াইয়ের ওপর কোনো আস্থা ছিল না আমার।' তপন সিংহের ছবিতে সমাজবাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পৃথ্বীশ রায়ের মনে হয়েছিল তপন সিংহ বরাবরই কেন্দ্রীয় সরকারী নীতিকে বাঁচিয়ে ছবি করেছেন। লিখে-ছিলেন, 'বনফুল তাঁর হাটেবাজারে উপন্যাসে নায়ক ডা. সদাশিব ভট্টাচার্যের (চলচ্চিত্রে নতুন নামকরণ করা হয়েছে ডা. মুখার্জি) মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্বটুকু রেখেছিলেন, স্বাধীনোত্তর কংগ্রেসি রাজনীতির সুবিধাবাদ নিয়ে যে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন, তপন সিংহ তা বাদ দিয়েছেন। এক দেবোপম ডাক্তার বনাম কুচক্রী লছমনলাল— এই রকম একটা ছকেবাঁধা একমাত্রিক কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় ছবিটি।'

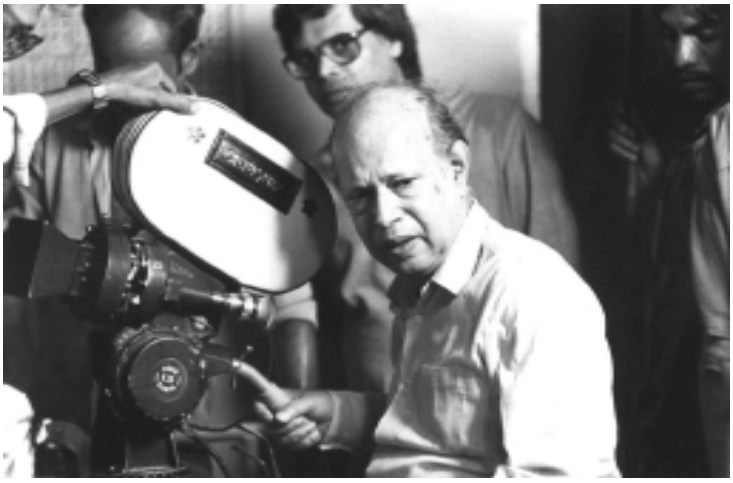

হ্যাঁ, একমাত্রিক। লছমনলাল বা তার বাবা ছবিলাল এলাকার সম্পন্ন ব্যবসায়ী। ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে পুলিশ সুপার, দারোগা সবাইকে হাতে রাখতে পারেন। সামাজিকতার খাতিরে তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্নের ডাক উপেক্ষা করতে পারেন না ডাক্তার মুখার্জীও। ওদিকে লছমনলাল হাটবাজারে জোরজুলুম চালায়, একের পর এক ধর্ষণ করে চলে। পুলিশ চৌকিতে কোনো হেলদোল পড়ে না। এর বিরুদ্ধে একা রুখে দাঁড়ান সিভিল সার্জন ডাক্তার মুখার্জি।

'হাটে বাজারে'-র ডাক্তার মুখার্জিকে এই ছাঁচে ফেলে দিলে কিন্তু ভুল হবে। তিনি মোটেই অ্যাংরি ইয়াং ম্যান নন। তাঁকে ধীরোদাত্ত গুণান্বিত করে গড়ে তুলেছেন বনফুল-তপন, কিন্তু তাঁর মধ্যে সতীনাথ ভাদুড়ির 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর গানহীবাবা-ব রূপকল্প খোঁজা চলে না। তবু তাঁরই মধ্যে যে সদগুণগুলির সমাহার ঘটে, তাতে স্বাধীন ভারতের তরুণকে উদ্দেশ্য করে মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধির বাণীটি আমাদের ভাবনায় নাড়া দিয়ে যায়। গান্ধিজি বলেছিলেন, সত্যিকারের ভারতকে চিনতে হলে, তার সেবা করতে হলে যেতে হবে গ্রামে। কারণ সেখানেই ভারতাত্মার আসল চেহারা দেখতে পাওয়া যায়। 'হাটে বাজারে' মুক্তি পেয়েছিল ১৯৪৭-এর ঠিক দু দশক পরে। বিশ সাল বাদ। স্বাধীনতার দু দশক পরে স্বরাজ আনবার নাম করে আমরা যে খাসা পোড়া বার্তাকু এনেছি (সৌজন্য- কবি নজরুল ইসলাম), 'হাটে বাজারে' তাকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন দেশের নাগরিকদের মধ্যে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে, তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এই অনুসন্ধানের বাহক হচ্ছেন একজন ডাক্তার।

ডাক্তার মুখার্জী।

'হাটে বাজারে' ছবি যত এগোতে থাকে, লছমনলালের সঙ্গে ডাক্তার মুখার্জির সংঘাত তত বাড়তে থাকে। এলাকায় মৌরুশি পাট্টা কায়েম করে বসা লছমনলাল অ্যান্ড কোং হাত বাড়ায় হাসপাতালের দিকে। কলকাতার ওষুধ কোম্পানীকে হঠিয়ে নিজেই ওষুধের দোকান খুলে হাসপাতালে ওষুধ সাপ্লাই করার মতলব আঁটে। সে গুড়ে বালি ছিটিয়ে দেন ডাক্তার মুখার্জী। পুলিশ ও প্রশাসনের টিকি নিজেদের আঙুলে বেঁধে রাখা নিও-ক্যাপিটালস্টিদের পথের কাঁটা হয়ে ওঠেন।

রুগ্ন স্ত্রী-র মৃত্যু হলে সংসারের বাঁধন ছেড়ে

বেরিয়ে আসেন তিনি। ছেড়ে দেন সরকারী চাকরি। যত অনায়াসে 'ছেড়ে দেন' কথাটি লেখা গেল তাঁর ওই ছেড়ে দেওয়া নিশ্চয়ই তেমন ছিল না। তবু ছেড়ে দেন। নিজের ভাষায় 'আউটকাস্ট' হন। নিজেকে আরও একবার উৎসর্গ করেন শুশ্রূষার ব্রতে। জনান্তিকে বলেন, 'অন্য কাজ করব বলে ছাড়লাম, বিবাগী হবার জন্য নয়। ভাবছি ডাক্তারি করব, ডাক্তারি ব্যবসা নয়।' তাঁর যে গাড়িটি ছিল, সেটি বেচে দেন এক মোটর গ্যারেজে। গড়িয়ে নেন একটি মোবাইল ভ্যান যার গর্ভে ঢুকে পড়তে পারে রোজকার চিকিৎসার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম। অক্সিজেন সিলিন্ডার। মিনি অপারেশন থিয়েটার। যে সব হাটুরে তাঁকে ভালোবাসেন, ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে চলতে শুরু করে চলমান ডাক্তারখানা। কেউ বর্ণহিন্দু, কেউ মুসলমান, বেশির ভাগ তথাকথিত নিম্নবর্গীয় প্রান্তজন কিংবা মূলবাসী। হাটের পাশে ফাঁকা এক চিলতে জমি। সেখানে এসে থামে ডাক্তারবাবুর ভ্যান। মনমোহিনী বিড়ির উচ্চকিত ক্যানভাসিং, হাওদা আঁটা হাতির পিছনে ছোটো হাটুরেদের কানে এই নয়া ডাক্তারখানার খবর পৌঁছে দেন অনেক কালের ড্রাইভার খালেদ। ব্যাস, আর দেখতে হয় না। উপচে পড়ে চিকিৎসাপ্রার্থীর ভিড়। স্বেচ্ছাসেবীদের কেউ চোঙা ফুঁকে জানান দেয় এই পরিষেবার কথা। কেউ ফাইফরমাশ খেটে দেয়। যে ছিপলিকে ভোগীর লালসা থেকে রক্ষা করা ডাক্তার মুখার্জীর আরেকটি ব্রত, সেই তাঁকে শিখিয়ে নেন নার্সিং-এর কাজ। মাসে ৪০ টাকা করে মাইনে দেন, খাওয়া-পরা সব। নন-টেকনিক্যাল আনস্কিলড অ্যাসিস্টেন্ট হয়ে পাশে দাঁড়ান নুটুবিহারী। রুগির হিসাব রাখেন। 'কী হবে ওই সব রেখে?' ডাক্তারবাবু শুধোন। নুটুবিহারী বলেন, 'ইতিহাস রচনা করব।' বাড়ির রান্নাঘর, রাঁধুনি বামুন আজবলাল উজিয়ে আসে ওই গাছতলায়। যারা কাজ করে সবাই দিনের শেষে মুরগির মাংস আর ভাত পায়। আজবলাল একে বলে 'ভূতভোজন।' হাটের পাশে উঁচু জমিতে গাছতলায় জমে ওঠে এক অদ্ভুত স্বাস্থ্য উদ্যোগ।

এন জি ও প্রজন্মের মানুষ হয়ে আমরা ভাবতে থাকি এই সমবায়ী উদ্যোগটির পৃষ্ঠপোষণা করেন কোন মহাজন? তিরিশ বছরের সরকারী চাকরি আর প্রাইভেট প্র্যাকটিসের জোরে এতকিছু? গোড়ায় গাড়ির জন্য গ্যারাজওয়ালেকে ২০০০ টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছিলেন তিনি। ব্যাস। গাছতলায় এসে

ডাক্তারবাবু তো পারতপক্ষে টাকাপয়সার কথা পাড়েন না। বলেন, 'যার যা ক্ষমতা ওই বাক্সের মধ্যে দিয়ে দেবে। ওই দিয়ে খালি ওষুধ কেনা হবে।' কেউ দু পয়সা এগিয়ে দিলে ফিরিয়ে দেন না, এই মাত্র। উপরন্তু হাত উলটে বাচ্চাদের জন্য কমলালেবু কিনে রাখেন। নুটুবিহারীকে, 'চলুক না যে কদিন হয়। অন্তত সে কদিন আনন্দ তো পেয়ে নিই।' শ্রমিক-বস্তির নিত্যদিনের সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যান তিনি। এক শ্রেণীমুক্ত অণুসমাজ গড়ে ওঠে তাঁকে ঘিরে।

সবার যে তাতে সুবিধা হবে তা ভাবার কোনও কারণ নেই। তাঁর স্বজাতির ভদ্দরলোকেরা বাড়ি বয়ে এসে বলে যায়, 'আপনি তো ওদের মাথায় তুলেছেন, যা আশকারা দিচ্ছেন।' ডাক্তারবাবু কথা বাড়ান না, খালি বলেন, 'কত দিন আর পায়ের তলায় পড়ে থাকবে!'

এ ছবি বিয়োগান্তক। যে শ্রমিক-বস্তিতে ছিপলি থাকে সেখানে এক উৎসবের রাতে চড়াও হয় লছমনলাল। ছলচাতুরি করে ভোগ করতে চায় ছিপলিকে। কাকতলীয় ভাবে অকুস্থলে হাজির হন ডাক্তার মুখার্জী। ছিপলিকে উদ্ধার করতে লছমনলালের সঙ্গে মারামারি করেন তিনি। লড়াই শেষ হলে দেখা যায়, ছিপলি রেহাই পেয়েছেন, লছমনলাল এ জন্মের মতো শায়েস্তা হয়েছে, মারাত্মক আঘাত পেয়ে ভূলুণ্ঠিত ডাক্তার মুখার্জীর দেহ। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়তে বেশি দেরি হয়নি।

এর পরেও কয়েক মিনিট চলেছে 'হাটে বাজারে'। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে আসা এক নবীন ডাক্তার অনিমেষ কিছুদিন ডাক্তার মুখার্জীর সহকারীর কাজ করছিল। কোনো বিনিময়মূল্যের আশা না করেই। ডাক্তার মুখার্জীর অকালপ্রয়াণের পর সেই নবীন এগিয়ে এসে ওই কর্মোদ্যোগের নেতৃত্ব দিতে। পথপ্রদর্শক চলে যান। রেখে যান পথকে, আর কিছু পথিককে। দু ঘন্টার ছায়াছবি শেষ হয়।

শঙ্কর গুহনিয়োগী 'হাটে বাজারে' দেখেছিলেন কিনা এই ভাবনা উইশফুল থিংকিং। ভেলোর ক্রিশ্চান মেডিক্যাল কলেজ অডিটোরিয়ামে কখনও কি 'হাটে বাজারে' দেখানো হয়েছিল? বিনায়ক সেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তাঁদের দেখানো পথে যাঁরা হাটেমাঠেবাটে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে পৌঁছে দিতে প্রাণপাত করেন, সযত্নে ঢেকে দেন সরকার বাহাদুরের ফুটিফাটা বন্দোবস্তকে, তাঁরাও কি 'হাটে বাজারে' থেকে কখনও চলার পথের হদিশ পেয়েছেন? জানি না। তবু তাঁদের যখন দেখি মনে মনে 'ডাক্তারি করব, ডাক্তারি ব্যবসা নয়' এই মন্তর জপে চলেছেন তখন মনে হয় বোধ হয় আমাদের দেশের মাটিতেই বোধ হয় এই নিঃস্বার্থ লোকহিতের বীজতলা রয়ে গেছে। অঙ্কুর বেরোতে কখনও সখনও সময় লাগে। অনিমেষরা আছেন আমাদের মধ্যে।

আর জানি যে কমিউনিটি হেলথ পাবলিক মেডিসিনের আদর্শকে এ ভাবেই চলমান চিত্রমালায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তপন সিংহ। আজ থেকে প্রায় পাঁচ দশক আগে।

লেখক পরিচিতি : অংশুমান ভৌমিক— শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিল্প-সমালোচক

চিত্র : রুদ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

বই পড়া

আরোগ্য-নিকেতন— চিকিৎসা-ব্যবসায়, নাড়ী-বিদ্যা, আধুনিক চিকিৎসা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক সংগ্রাম

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য

কথার কথা

আজ ২০১১ সালে একজন চিকিৎসকের অবস্থান থেকে আরোগ্য-নিকেতন নতুন করে পাঠ করার মাঝে এক নতুন করে পাবার আনন্দ আছে, নতুন করে ভাবার কিছুটা ঝুঁকিও আছে। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে যে লেখা বাংলা সাহিত্যের এক সম্পদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো, ২০১১ সালে একে ফিরে পড়তে গেলে ৫৮ বছর সময়ের ব্যবধানে চিকিৎসার বোধে, সাহিত্যের বোধে সমাজ-সংস্কৃতির পরতে পরতে যে সব পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবীভাবে ঘটেছে সেসবের ছাপ তো পড়বেই। এ ছাপগুলো বোধ করি লেখককে মৃত করে ফেলে না, মৃত লেখকের স্থায়ী সম্পদের সুদ হিসেবে একজন পাঠকের ঋণ জমা হয়।

এ উপন্যাসে একটি বিশেষ স্থান নিয়ে আছে মৃত্যু। মৃত্যু অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীর ক্যানভাসের মতো কাজ করে এখানে, যে পটভূমিতে জীবনের কথা, বেঁচে থাকার কথা, মানুষ তথা রোগীর কথা বলা হয়। এ কারণে এ উপন্যাস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেক শিক্ষিত মানুষেরই মনে পড়বে আরেকটি যুগান্তরী সৃষ্টি The Death of Ivan Ilych-এর কথা। কিন্তু দুটির মাঝে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ইভান ইলিচ একজন ব্যক্তি, কেবল একজন ব্যক্তি হিসেবে নিজের রোগ-যন্ত্রণা, অসহনীয় কষ্ট বহন করে। ইলিচ ক্রম-বিকশিত অণু সত্তার জন্ম দেওয়া সমাজের সন্তান বা Victim, আরোগ্য-নিকেতনের জীবন মশায়— মানুষের বহমান, যাপ্য জীবনের মাঝে স্থিত এক ব্যক্তি যিনি প্রতিটি পল-অণু পলে মানুষের মাঝেই থাকেন, এর পরম আনন্দময় উপস্থিতি অনুভব করেন। বিপরীতে ইভান ইলিচের রোগাক্রান্ত পরিস্থিতির মুহূর্তে— "He wept on account of his helplessness, his terrible loneliness, the cruelty of man, the cruelty of God, and the absence of God." তার কাছে কোনো ঈশ্বর নেই, কোনো চিকিৎসক নেই পাশে দাঁড়ানোর জন্য, নেই কোনো বান্ধব। ১৮৮৬ সালে লেখা এ গল্পের সাথে আরোগ্য-নিকেতনের সময়ের পার্থক্য ৭০ বছরের। কম উন্নত বা তখনো কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর রাশিয়াতেও একক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে গেছে। ১৯৫৩-র বাংলায় মানুষ ও জীবন মশায়ের মতো চিকিৎসক সামাজিকভাবে স্থিত, মশায়ের রোগীরাও সামাজিক মানুষ, একক

ব্যক্তি নয়। আরো অনেক আর্থ, সামাজিক, রাজনৈতিক উপাদান ছাড়াও নতুন মেডিসিন এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে এই ব্যক্তি মানুষের জন্ম সম্ভব করে তুললো, বিশেষ করে নাগরিক ভারতে। আরোগ্য-নিকেতন এর একটি জীবন্ত দলিল বলা যেতে পারে। ডেভিড আর্নল্ড আমাদের জানান যে ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে পশ্চিমী শাসনের অবসানের পরে পশ্চিমী চিকিৎসা যে অভূতপূর্ব মান্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করেছে ভারতবর্ষে এর আগে কখনো তা ঘটেনি। এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। (আর্নল্ড, "The rise of western medicine in India", Lancet 1998, 348, pp. 1075-1078.)

১৯৪৭-এর পরে জীবন মশায়ের কার্য-ক্রম।

আরোগ্য-নিকেতন নিয়ে বিভিন্ন স্তরে, পরতে পরতে আলোচনা করা যায়। তন্নিষ্ঠ পাঠক, সমালোচক, গবেষক এবং আরো অনেকে তা করেওছেন। আমাদের আলোচনায় আমরা কেবলমাত্র সীমায়িত থাকবো চিকিৎসক জীবন মশায়, তাঁর চিকিৎসা, সমষ্টি মানুষের সাথে তাঁর ঘন-পিনদ্ধ একান্ততা এবং প্রদ্যোৎ-এর মধ্য দিয়ে আধুনিক চিকিৎসা ও এর বিভিন্ন প্রকরণের যে আবির্ভাব তার সাথে মশায়ের সম্পর্ক কিভাবে বিবর্তিত, নির্মিত ও চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছেছে (এক অর্থে catharsis-ও বটে) সে পরিসরটুকুতে। এ পরিসরটুকুতেও পাঠের অমোঘ ও স্বাভাবিক নিয়মে পাঠকের নতুন ব্যাখ্যা, অনুসন্ধানের নতুন সুলুক-সন্ধান এসে মিলবে।

উপন্যাসের গোড়ার দিকে যখন ক্রম-ব্রাত্যায়িত জীবন মশায়ের সাথে আধুনিক চিকিৎসার সংঘাতের ক্যানভাস রচিত হচ্ছে সে সময় সাধারণ মানুষের চোখে মশায়ের বর্ণনা দিচ্ছেন লেখক— সে আমলের ডাক্তার, তাও পাস করা নয়। আসলে হাতুড়ে। এখনকার চিকিৎসায় কত উন্নতি হয়েছে। সে সবের কিছু জানে না।

কেউ কেউ বলে, গোবদ্যি।

এখানে এসে একটু পেছনে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে। ১৭৯৯ সালে ফর্স্টার (H.P. Forster) সাহেবের লেখা A Vocabulary, in Two Parts, English and Bongalee, and Vice Versa প্রকাশিত হলো। Vocabulary-র ২য় খন্ড প্রকাশিত হলো ১৮২০-এ। ২য় খন্ডে গোবদ্যি শব্দটির উল্লেখ আছে। ইংরেজি প্রতিশব্দ দেওয়া আছে Quack doctor. আবার ১ম খন্ডে Surgeon-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আছে অস্ত্রবৈদ্য, আসুরি চিকিৎসক, ঘাররোজা, ঘায়ের ওঝা ইত্যাদি। আয়ুর্বেদ-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে আছে Physic (the Science), বেশ কৌতুহলজনক যে দুটি খন্ডের একটিতেও অ্যানাটমি শব্দটি নেই। এমনকি dissection-এরও কোনো উল্লেখ নেই। একটি Vocabulary বা dictionary যদি একটি বিশেষ সামাজিক জীবনের পরিবেশে বিচরমাণ শব্দাবলীর সমাহার বোঝায়

(এবং বাস্তবেও ঘটে), তাহলে এটা লক্ষ্যণীয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় ইংরেজ সাহেবের নিজ দেশে আহরিত অ্যানাটমি বা ডিসেকশন-এর জ্ঞান এদেশের শব্দাবলীর জন্য প্রয়োজনীয় মনে করছেন না। আমরা আমাদের আলোচিত উপন্যাসে দেখবো কেবলমাত্র এ দুটি বিষয়ের ওপর দখল কিভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞানের সিংহাসন দখল করছে।

উপন্যাসের কথা

১৯৫৬ সালের ১৩-ই আগস্টে (আরোগ্য-নিকেতন-এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরে) ব্যোমকেশ মজুমদারকে একটি চিঠিতে তারাশংকর জানিয়েছিলেন— জীবন মশায় বাস্তবে ছিলেন কি না প্রশ্ন করেছেন। ছিলেন। তাঁকে দেখেছি, তাঁর ওষুধ খেয়েছি। এবং যেসব রোগী ও রোগের কথা লিখেছি তার পনের আনাই সত্য। ....কিশোর যার নাম তার বাল্যবয়সটায় আমিই কিশোর।

প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানশাস্ত্র অনুযায়ী প্রত্যক্ষ তথা অধুনা ইংরেজিতে বহুল ব্যবহৃত embodied experience থেকে যাত্রা শুরু উপন্যাসের। এ কারণে আর পাঁচটা উপন্যাসের সাথে আরোগ্য-নিকেতনের পার্থক্য বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হয়। আরোগ্য-নিকেতন অর্থাৎ চিকিৎসালয়। হাসপাতাল নয় দাতব্য চিকিৎসালয়ও নয়— দেবীপুর গ্রামের তিন পুরুষ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী মশায়দের চিকিৎসালয়।

বিশেষ করে ১৮৫৩-এ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ তৈরির পরে এ দেশে হাসপাতাল মেডিসিন, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল এবং প্রত্যন্ত এলাকায় চিকিৎসা নামক অতি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের শিকড়কে পৌঁছে দেবার জন্য প্রচুর সংখ্যায় দাতব্য চিকিৎসালয় বা ফ্রি ডিসপেনসারি তৈরী হতে থাকে। উপন্যাসের প্রথম অনুচ্ছেদেই লেখক এ দুটির সাথে আরোগ্য-নিকেতনের পার্থক্য সূচিত করলেন। এ দুটি থেকে আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান, আবার দাতব্য নয়। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী মশায়দের চিকিৎসালয়। অথচ জীবন মশায়ের চিকিৎসা ব্যবসায়ের কোন উল্লেখযোগ্য নজির গোটা উপন্যাসে নেই। শুরুতেই উপন্যাসের বীজমন্ত্র যাপিত হয়— লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যম অর্থাৎ আরোগ্য-লাভই সংসারের শ্রেষ্ঠ লাভ। এরকম একটি মানসিক অবস্থান থেকে শুদ্ধমাত্র অর্থনৈতিক লাভের জন্য চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। বরঞ্চ কাঞ্চন মূল্যের বদলে সাবেকি in kind ধরনে ভালোবাসার মূল্য দেয় উপন্যাসের একটি চরিত্র পুরনো কালের লোক পরান— খেতের ফসল, পুকুরের মাছ ডাক্তারের বাড়ি মধ্যে মধ্যে পাঠায়। কখনও নিজেই নিয়ে আসে।

In cash এবং in kind-এর টানাপোড়েন শুরু হয়ে যায় উপন্যাসের একেবারে গোড়া থেকে। লক্ষ্য করার হলো স্বাধীনতা-উত্তর রাঢ় বাংলার যে চিত্র তারাশংকর এঁকেছেন সেখানে আধুনিক চিকিৎসার প্রতিনিধি হয়ে চিকিৎসক প্রদ্যোৎ-এর যে সত্তা আমরা দেখি তাঁর মাঝেও আজকের মতো বাজার নির্দ্ধারিত পণ্য মূল্যের আকাঙ্ক্ষা অনুপস্থিত। ওঁর কাছেও রোগীর আরোগ্য লাভ-ই প্রধান প্রাপ্তি। মতির মা-র শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ওঁর প্রত্যয় উচ্চারিত হয়— না; বেঁচে যাবে বুড়ী! মতি কিছু খরচ করতে প্রস্তুত আছে, বাকিটা হাসপাতাল থেকে ব্যবস্থা করে ওকে আমি খাড়া করে দেব। *ওকে মরতে আমি দেব না।* (আমাদের নজরটান)

এবং এই প্রত্যয়ের হাত ধরে আসে দুটি বিষম জ্ঞানের জগতের সংঘাত। জীবন মশায় রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করে নিদান হাঁকেন। (এখানে নিদানের ব্যবহার হয়েছে prognosis অর্থে, যদিও আয়ুর্বেদে নিদান বলতে প্যাথলজি বা etio-pathogenesis বোঝায়।)

ঘাড় নেড়ে মশায় জানান যে নিদান হেঁকে তাঁর বুড়িকে মারতে হবে না। বুড়ি নিজেই মরবে। মশায় বলেন— তিন মাস কি ছ মাস— এর মধ্যেই ও মারা যাবে। ওর অনেক ব্যাধি পোষা আছে।

প্রদ্যোৎ-এর বক্তব্য— পেনিসিলিন- স্ট্রেপ্টো-মাইসিন-এক্স-রে— এসবের যুগে ওভাবে নিদান হাঁকবেন না। এগুলো ঠিক নয়। জড়ি বুটি সর্দি পিত্তি এসবের কাল থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি আমরা।

আমাদের কাছে এক লহমায় পরিস্ফুট হয়, একদিকে আয়ুর্বেদের ত্রি-দোষ তত্ত্ব অন্যদিকে আধুনিক মেডিসিনের প্যাথলজি, ম্যাজিক বুলেট তথা অ্যান্টিবায়োটিক-নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতি— এ দুয়ের মাঝে অনতিক্রম্য সংঘাত তৈরী হচ্ছে। উপন্যাসের স্তরে স্তরে ধরা পড়ে গ্রামের মানুষের নিজের মানুষ হিসেবে মশায়ের অবস্থান, তাঁর ওপর হিন্দু-মুসলমান, জাত-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নির্ভরতা, নাড়ী পরীক্ষায় তাঁর অভ্রান্ততা। আবার আধুনিক চিকিৎসা ও হাসাপাতালের ওপরে মন্দ গতিতে অনিবার্য নির্ভরশীলতাও জন্ম নিচ্ছে। শুরু হচ্ছে দুটি জ্ঞানতত্ত্বের সংগ্রাম। শেষ অবধি বিজয়ীর বেশে আসে আধুনিক চিকিৎসা। প্রদ্যোৎ স্বাভাবিক নিয়মে বিজয়ীর অমোঘ বার্তা ঘোষণা করে— তা ছাড়া এসব হল ইনহিউম্যান— আমানুষিক।

> ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে পশ্চিমী শাসনের অবসানের পরে পশ্চিমী চিকিৎসা যে অভূতপূর্ব মান্যতা ও ক্ষমতা অর্জন করেছে ভারতবর্ষে এর আগে কখনো তা ঘটেনি।

অমানুষিক কবিরাজী চিকিৎসা ধীরে ধীরে স্থান ছেড়ে দেবে হিউম্যান— মানুষিক চিকিৎসার কাছে। জীবন মশায় তাঁর সমস্ত কাল-সঞ্চিত জ্ঞান, প্রতিটি মানব সন্তানের জন্য পিতৃত্বের মমতা, জীবনের একান্ত বান্ধব হয়ে মানুষের জীবনে লীন হয়ে থাকা— এ সমস্ত কিছু নিয়ে হেরে যাবেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন মান্য ও নির্ভরযোগ্য গবেষক Roy Porter অবশ্য মনে করেন— I do not think that “winners” should automatically be privileged by historians.... but there is good reason for bringing winners to the foreground– not because they are the “best” or “right” but because they are powerful. (The Greatest Benefit to Mankind, Harper Colins, 1997 p. 12)

এখানে আরো দু-একটি কথা বলে নেওয়া ভালো। প্রথমটি হলো আয়ুর্বেদে দেহের ধারণা দ্বিমাত্রিক, দেহের মাঝে অনেকগুলো স্রোতবাহী নালী ইত্যাদি রয়েছে যেগুলো দিয়ে বায়ু পিত্ত কফের মতো বিভিন্ন রস প্রবাহিত হয়। এরকম বিভিন্ন রসের ভারসাম্যের অভাব, প্রকৃতি বা ম্যাক্রোকসম-এর সাথে বিষমতা কিংবা আগন্তুজ কারণে (যার স্বরূপ নিরুপণ করা যায় না) রোগের উৎপত্তি। দেহের পরিসরে রোগের প্রকাশ ঘটলেও রোগের জন্ম বহুক্ষেত্রেই দেহাতিরিক্ত পরিসরে। এ কারণে এখানে রোগের diagnosis-এর চাইতে অধিকতর গুরুত্ব পায় prognosis। আরোগ্য-নিকেতনের প্রায় ১০০ বছর আগে সূর্য গুডিভ চক্রবর্তীর ১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত একটি লেখায় নীলমণি সেন

নামে এক কবিরাজের উল্লেখ আছে, তিনিও রোগীর prognosis নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারতেন।

এর বিপরীতে, আধুনিক চিকিৎসায় দেহের ধারণা ত্রিমাত্রিক। প্যাথলজিকাল অ্যানাটমি, শব-ব্যবচ্ছেদ এবং রোগের কোষ বা অঙ্গ-স্থানিকতা এ চিকিৎসা পদ্ধতিকে পরম প্রত্যয়ী করে তুলেছে। দ্বিতীয়, নাড়ী পরীক্ষার বিষয়টি বৃহত্রয়ীর (চরক, সুশ্রুত এবং বাগভট) যে প্রাচীন জ্ঞান-ভান্ডার তাতে অতিরিক্ত কোনো গুরুত্ব পায় নি। রুটিন পরীক্ষার একটি পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অধুনা আয়ুর্বেদের ইতিহাসের ক্ষেত্রে চলমান বিশ্বকোষ হিসেবে স্বীকৃত ও সর্ব-মান্য মিউলেনবেল্ড মনে করেন— A new branch of Ayurveda suddenly appears in the thirteenth and fourteenth centuries. This branch, called Nadisastra, is concerned with diagnostics and prognostication by means of the examination of the pulse... I feel that Nadisastra did not become fully integrated with Ayurveda, since most treatises contain only few verses on the subject, while, on the other hand, a separate class of monographs on pulse lore came into existence. (G. Jan Meulenbeld, "The Many Faces of Ayurveda", Journal of the European Ayurvedic Society 1995, 4:1-10)

আমরা একটু ভাবলে বুঝবো রোগ নিরূপণের নির্দিষ্ট, সঠিক ও অভ্রান্ত কোনো পদ্ধতি করায়ত্ত না থাকার জন্য পরবর্তীকালের আয়ুর্বেদজ্ঞরা নাড়ী পরীক্ষার দিকে বেশি বেশি করে ঝুঁকেছেন। একান্ত নিষ্ঠাভরে নাড়ীর গতি-প্রকৃতি বুঝতে প্রয়াসী হয়েছেন। বহুক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভও করেছেন। নাড়ী পরীক্ষার সাথে অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাঢ় বঙ্গের, তন্ত্র-সাধনাও যুক্ত হয়েছে। তারাশংকর এ অঞ্চলের মানুষ। একদিকে মূল আয়ুর্বেদের নিদান ও আগন্তুজ রোগের ধারণা নিয়েছেন, অন্যদিকে পরিবর্তিত চেহারার নাড়ী-জ্ঞানকে করেছেন আয়ুর্বেদের প্রধান স্তম্ভ। ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে বড়ো কঠিন পরিস্থিতিতে আয়ুর্বেদের সাধকেরা তাঁদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন। এদের সম্বল ভেষজ জ্ঞান (যে জ্ঞান উপনিবেশিক চিকিৎসা একসময় ভীষণরকমে আত্মস্থ করেছিলো,

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর উদ্ভবের সাথে সাথে পূর্ণত প্রান্তিক করে দেয়।), মানুষী অস্তিত্বের প্রতি মমতা, যোগী ও শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে শেখা নাড়ী-জ্ঞান।

তারাশংকরের সংকট শুরু হয়েছে এ যাত্রাপথে। তিনি বাস্তব জীবনে জীবন মশায়কে দেখেছেন। তাঁর অসামান্য মানবিক অস্তিত্ব স্মৃতিপটে বড়ো জীবন্তভাবে উৎকীর্ণ। আবার তাৎক্ষণিক বা স্বল্পকালে পরিস্ফুট রোগের ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসার অসম্ভব শক্তি ও সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করতে পারছেন না, বরঞ্চ নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে একে গ্রহণ করেছেন। মশায়ের চিন্তায় বিরাজ করে— এ চিকিৎসা-শাস্ত্র বিপুল গতিবেগে

আরোগ্য-নিকেতন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী মশায়দের চিকিৎসালয়। অথচ জীবন মশায়ের চিকিৎসা ব্যবসায়ের কোন উল্লেখযোগ্য নজির গোটা উপন্যাসে নেই।

এগিয়ে চলেছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র খুলে দিয়েছে দিব্যদৃষ্টি। রোগোৎপত্তির ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আজ সবই প্রায় আগন্তুজ ব্যাধির পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল।

এ ছাড়া তিনি অস্ত্র-চিকিৎসার কথা শুনেছেন। টি বি-তে স্ট্রেপ্টোমাইসিন ছাড়াও পি-এ-এস বলে একটা ওষুধ বেরিয়েছে বলে শুনেছেন। দুটোর ব্যবহারে নাকি আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। রঙ্গলাল ডাক্তারের কথা মনে পড়ে তাঁর— শুধু পালানোটাই চোখে পড়ছে তোমার; মানুষ তার সঙ্গে অবিরাম লড়াই করছে দেখছ না? পিছু হঠেই আসছে সে চিরকাল— কিন্তু যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে আসে নি। নূতন নূতন অস্ত্রকে উদ্ভাবন করছে, আবিষ্কার করছে। সে চেষ্টার তো বিরাম নাই তার। মৃত্যুকে রোধ করা যাবে না, মৃত্যু থাকবেই। কিন্তু রোগ নিবারণ সে করবে।

জীবন মশায়— প্রদ্যোৎ ডাক্তার

এতক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়ে যা আলোচনা হলো এর বাইরে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়ে যায় মশায়ের প্রসঙ্গে, এমন কি এরকম অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনাতেও। মশায় প্রথম জীবনে মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হয় নি জীবনের এক বিশেষ মোড়ে এসে। পরে রঙ্গলাল ডাক্তারের কাছে শিষ্য হিসেবে প্রশিক্ষিত হন আধুনিক চিকিৎসায়। এ ঘটনাক্রমে দুটি ব্যাপার আমাদের কৌতুহলী করে। একদিকে রঙ্গলালের আধুনিক চিকিৎসায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা, অন্যদিকে মশায়ের শেষ অবধি শিক্ষা শেষ করতে না পারা। রঙ্গলালের জীবনে দুটি বড়ো বাঁক আছে। হিন্দু পরিবার থেকে মিশনারি স্কুলে গিয়ে প্রথমে সংস্কার-চ্যুতি ঘটে। পরে এই সংস্কার-চ্যুত, সাধারণ মানুষের ভাষায় নাস্তিকবাদী পাথর, ময়ূরাক্ষীর জলে ভেসে যাওয়া মড়া টেনে নিয়ে ফালি ফালি করে চিরে দেখেন, এক কথায় private dissection। এই dissection আধুনিক চিকিৎসাকে সম্পূর্ণত এক নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমির ওপরে প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা স্মরণে রাখবো উনিশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নব্য-আয়ুর্বেদ বলে আয়ুর্বেদের যে নতুন আবির্ভাব ঘটে তার ভিত্তি-প্রস্তর তৈরি করেছিলো অ্যানাটমির আধুনিক পাঠ। এ ব্যাপারে বাংলায় পথিকৃৎ ছিলেন গণনাথ সেন।

মশায়কে শিক্ষা দিতে গিয়ে রঙ্গলাল একবার বলেছিলেন— তা ছাড়া আয়ুর্বেদ আগন্তুজ ব্যধি বলে যেখানে থেমেছে, ইউরোপের চিকিৎসা-বিদ্যা মাইক্রোস্কোপের কল্যাণে জীবাণু আবিষ্কার করে অনুমান ও উপসর্গের সীমানা ছাড়িয়ে চিকিৎসায় চলে এসেছে বহুদূরে এগিয়ে।

এর কিছুদিন পরে সম্ভবত নাড়ী-বিশেষজ্ঞ কবিরাজ হয়ে ওঠার ভবিতব্য নিয়ে, অবশ্য উপন্যাসের প্লট অনুযায়ী, জীবন মশায় ডিসেকশনের পরীক্ষায় ফেল করেন। যতোটা নিস্পৃহ হলে ডিসেকশন করা সম্ভব (যাকে আমরা আধুনিক চিকিৎসার পরিভাষায় William Hunter-এর বিখ্যাত উক্তি necessary inhumanity বা clinical detachment বলি) সেটা তাঁর করায়ত্ত হয় নি।

রঙ্গলাল জীবনকে বলেছিলেন— তোমার ডাক্তারি শেখাটা বোধ হয় ঠিক হল না জীবন। তোমার সে বৈজ্ঞানিক মন নয়। কার্য হলেই তোমার মন খুশী। কেন হল— সে অনুসন্ধিৎসা তোমার মনে নাই। তুমি বরং ডাক্তারি, কবিরাজ, মুষ্টিযোগ তিনটে নিয়েই তোমার ট্রাইসাইকেল তৈরি করো। ওতে চড়েই যাত্রা শুরু করো।

আমাদের মনে পড়ে যায় ১৮৯৯ সালে ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত R. Havelok Charles-এর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের কথা। সে প্রবন্ধে ভারতীয়দের অ্যানাটমির জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিলো— The education of the Indian has in the past been purely an intellectual training, and consequently he is defective in scientific observation and curiosity, being marked more for his powers of subtle speculation and poetic fancy, whilst lacking that exactness of learning given by the laborious investigation of facts. ("The Progress of the Teaching of Human Anatomy in Northern India", BMJ 30 Sept. 1899, pp. 841-844)

রঙ্গলালের সাথে কি অদ্ভুত মিল হ্যাভেলক চার্লসের। ভারতীয় ও ইউরোপের ধারার জ্ঞানতত্ত্ব ও শিক্ষণের মাঝে মৌলিক ও সুস্পষ্ট ভেদরেখা স্বতঃপ্রকাশিত। আবার জ্ঞানের এই বিশেষ empirics-কে ভয় করে আধুনিক চিকিৎসক প্রদ্যোৎ বা আধুনিক চিকিৎসা। জ্ঞানের জগতে নিটোল আত্মবিশ্বাসী হয়েও অজ্ঞাত empirics-এর অঞ্চলকে প্রতিষ্ঠাকামী জ্ঞান ভয় পায়। প্রদ্যোৎ-এর মুখের কথায়— কয়েকটা কেসেই আমি আপনাকে হাত দেখতে দিই নি। আমার ভয় হত, আপনি কী পাবেন— কী বলে দেবেন। আপনার হাত দেখাকে আমার সময় সময় ভয় লাগে।

প্রদ্যোৎ-এর সাথে কথোপকথনে জীবনের আরেকটি গভীরতর সত্য উচ্চারণ করেন জীবন মশায়। মৃত্যুকে প্রতিটি দেশ-অঞ্চল-জনগোষ্ঠী-সংস্কৃতি নিজের নিজের মতো করে দেখে এসেছে। তিনি তাঁর চিকিৎসক জীবনে একদিকে যেমন জীর্ণ পরিণতির ক্ষেত্রে মৃত্যুর নিদেন হেঁকেছেন, আবার অন্যদিকে যে প্রবীণ, যে বৃদ্ধ বয়সেও বহুজনের আশ্রয়, বহুকর্মের কর্মী তাকে বাঁচাতে মরণের সঙ্গে লড়াই করেছেন। এরকম কোনো চালচিত্র তৈরি হয় নি তখনো যে অসুস্থতা মানেই গৃহের পরিচিত পরিবেশ থেকে হাসপাতালের বিশেষ পরিবেশে যাত্রা শুরু হবে, আর শেষ হবে আরো অনেক রোগীর মাঝে রোগের নিজস্ব পরিসরে। রোগীর জীবনের বাস্তবতা আত্মা হারিয়ে যাবে হাসপাতালের অনাত্মীয় পরিবেশে। মৃত্যু সংক্রান্ত এসব ধারণা তখন সবে ক্রমোস্ফুটমান। ইভান ইলিচের ভাষায়— The white man's image of death has spread with medical civilization and has been a major force in cultural colonization. (Limits to Medicine, Penguin, 1976, p. 180)

সে সময়ের বাংলার সময়-বাহিত, অভিজ্ঞতা-সিঞ্চিত পরিবেশে যৌবন-জরা-বার্দ্ধক্য-মৃত্যু-কে জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে দেখার মানসিক স্থৈর্য প্রধানত বিরাজ করত। বহুক্ষেত্রেই চিকিৎসার ভয়াবহতার চেয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু বেশি কাম্য ছিলো। এমন কি রোগীর মৃত্যু অবধারিত জেনেও জীবন মশায় বারংবার পরমানন্দের শরণ নেন।

নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি এ বিশ্বাসে স্থিত থাকেন। তাঁর হৃৎপিন্ডে তিনবার আক্রমণ হয়েছিলো। দ্বিতীয় আক্রমণের আগের দিন নিজেই মৃত্যুর শরীরী রূপ বর্ণনা করেছিলেন প্রদ্যোৎ-এর কাছে— ডাক্তারবাবু, এইবার সে বকুলতলা থেকে বিশ্রাম সেরে উঠে দাঁড়াল। প্রদ্যোৎ-এর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি কথাটা। কারণ, রক্তচাপ সেই একরকমই ছিলো। এরপরে রক্তচাপ বাস্তবিকই বেড়েছিলো। সন্ধ্যেতে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। এর কদিন পরে হয়েছিল তৃতীয় আক্রমণ। প্রদ্যোৎ ডাক্তারকে বলেছিলেন— আমাকে ঘুমের ওষুধ দেবেন না। ঘুমের মধ্যে মরতে আমি চাই না। আমি সজ্ঞানে যেতে চাই।

শান্তভাবে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। তিনি জানতেন সে আসছে। তার পায়ের ধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছেন। প্রদ্যোৎ দেখলো— প্রগাঢ় একটি শান্তির ছায়া শীর্ণ মুখমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে।

জীবন মশায় চলে গেলেন। তার আগে প্রদ্যোৎ-এর সাথে তাঁর সখ্য তৈরি হয়েছে। চিকিৎসার জ্ঞানের নতুন সম্ভারকে তিনি শান্ত মনে গ্রহণ করেছেন, স্বাগত জানিয়েছেন। প্রদ্যোৎ তথা চিকিৎসক তখনো বাজার-নিয়ন্ত্রিত একজন স্বাস্থ্য পরিষেবক হয়ে ওঠে নি। তখনো সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের মানবসেবা নামের আদর্শবাদ তাঁর চোখে লেগে রয়েছে। তখনো নিউইয়র্ক আর নৈহাটি একাকার হয়ে যায় নি। যদি যেত তাহলে সে জীবন মশায়ের মৃত্যু শয্যায় তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকতো না। কারণ, কবিরাজি বা নাড়ীর জ্ঞান সে সময়ে নিতান্ত প্রান্তিক একটি বিষয় হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র কোটি কোটি মানুষের দেশে আধুনিক স্বাস্থ্য-পরিষেবার উপকরণগুলো পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয় বলে অধুনা AYUSH-এর মাঝে একে নিয়ে নেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের যুক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছে, ধরন-ধারণকে। ইউরোপে এ বিষয়টি আমাদের অনেক আগে ঘটেছে। এর অভিঘাতে আরেক যুগন্ধর সাহিত্যিক দস্তয়েভস্কির গভীর পর্যবেক্ষণ ছিলো— "You see, gentlemen, reason is a good thing, that can't be disputed, but reason is only reason and satisfies only man's intellectual faculties, while volition is a manifestation of the whole of life..... life frequently turns out to be rubbishy, all the same it is life and not merely the extraction of a square root." (Notes from underground, Penguin, 1972)]

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, সময় ও ঐতিহ্য-লালিত অভিজ্ঞতা, মৃত্যু, জীবন, বেঁচে থাকা, মানুষের জীবন স্পন্দনের মাঝে স্থিত চিকিৎসক, শেকড়হীন হাসপাতাল ইত্যাদি অপরিমেয় প্রসঙ্গের একটি চলমান আলেখ্য আরোগ্য-নিকেতন যা চিকিৎসা-ব্যবসায়ের অভিমুখে হলেও ব্যবসা করে না, জীবনের আরেকটি মাত্রা এবং ভিন্নতর অর্থ বহন করে।

লেখক পরিচিতি: ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য, এম.বি.বি.এস., পি.এইচ-ডি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ে তন্নিষ্ঠ গবেষক ও লেখক।

চিঠিপত্র

ঘাড়ে ব্যথা মানেই হাড়ে ব্যথা নয়

প্রিয় সম্পাদক,

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' ডিসেম্বর ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত ডা. সুব্রত গোস্বামীর লেখা ''ঘাড়ের ব্যথা'' প্রসঙ্গে দু-চার কথা—

১) ঘাড়ে ব্যথার একটা বড় কারণ মেরুদণ্ডের আশেপাশের নরম তন্তু, মূলত মাংসপেশির ব্যথা, ফাইব্রোমায়ালজিয়া (fibromyalgia), টেনসন মায়ালজিয়া (tension myalgia), মায়োফাসাল সিন্‌ড্রোম (myofascial syndrome) ইত্যাদি নামে এগুলোকে বলা হয়। আমার কাছে যে ঘাড়ে ব্যথার রুগীরা আসেন, তাঁদের অন্তত তিরিশ শতাংশই এই ধরনের রুগী।

২) কতকগুলি systemic রোগ (সারা শরীরের রোগ) ঘাড়ে ব্যথা দিয়েই শুরু হয়। যেমন রিউম্যাটয়েড আর্থাইটিস (rheumatoid arthritis), অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পণ্ডিলাইটিস (ankylosing spondylitis) ইত্যাদি।

৩) ডা. গোস্বামী পরামর্শ দিয়েছেন প্রয়োজন হলে ব্যথা বিশেষজ্ঞ, স্নায়ু বিশেষজ্ঞ অথবা অস্থি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে। শুধু ফিজিক্যাল মেডিসিন এবং রিহাবিলিটেশন (PMR) বিশেষজ্ঞের কথা বাদ দিয়েছেন, অথচ সব সরকারি হাসপাতালেই উপরোক্ত বিশেষজ্ঞরাই ঘাড়ে ব্যথার রুগীদের পি. এম. আর. বিভাগে পাঠান (তবে প্রাইভেট ক্লিনিক থেকে রুগী পাঠাতে হয়তো দ্বিধা বোধ করেন)।

৪) ডা. গোস্বামীর মতে ঘাড়ে ব্যথার ''আধুনিকতম এবং সাম্প্রতিকতম চিকিৎসা হল— ইন্টারভেনশনাল পেইন ম্যানেজমেন্ট''। এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য পেইন ম্যানেজমেন্ট ব্যথা কমাবে, রোগ কমাবে না।

ডা. আশীষ কুমার কুণ্ডু এম. ডি.
বিশেষজ্ঞ, ফিজিক্যাল মেডিসিন
অ্যাণ্ড রিহাবিলিটেশন

একটি অভিজ্ঞতা— কিছু শিক্ষা

প্রিয় সম্পাদক,

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বুকে ব্যাথা নিয়ে লেখা ও হার্ট অ্যাটাক নিয়ে প্রবন্ধ— এ দুটি পড়ে আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে ইচ্ছা করছে।

জঙ্গলমহলের ভৈরববাঁকী নদীর তীরে কোনও এক আদিবাসী গ্রাম। আধুনিক চিকিৎসার ছিটেফোঁটাও পৌঁছয় নি সেখানে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, বিজ্ঞানচিন্তা— সবেরই অভাব রয়েছে। বিজ্ঞান কি? এই প্রশ্নের উত্তর জানার আগ্রহ তেমন কারোর নেই বললেই চলে। শম্ভু সোরেন সেই গ্রামেরই একজন জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। বামপন্থী গণআন্দোলনের সক্রিয় কর্মী তিনি, পড়াশোনা না জানলেও বিজ্ঞানকে জানতে বুঝতে, বা তাকে শিখতে, তাঁর প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। ডাইনি বিষয়ে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে বোঝাতেন যুক্তি দিয়ে। কুসংস্কার নিয়ে ইতিবাচক ভূমিকা ছিল তাঁর, এছাড়াও ছিল বিভিন্ন গুণাবলি। সে প্রসঙ্গে আর না গিয়ে আমার বিষয়ে আসি।

শম্ভুদার বয়স তখন আনুমানিক ৩২-৩৪ বছর হবে। স্বাস্থ্য বেশ মজবুত, মাঠে ঘাটে পরিশ্রম করার ক্ষমতা কম নয়। অসুস্থতার কথা সেভাবে শোনা যায়নি কখনো— বড়জোর সামান্য জ্বর কাশি সর্দি, চেঙ্গাইলে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সামান্য কিছু শারীরিক সমস্যা নিয়ে এসেছেন কয়েকবার। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হিসাবেই সবাই তাঁকে জানত।

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর নাগাদ একদিন সেই মানুষটারই বিপদ ঘনিয়ে এল। সকালবেলা বৌদির (শম্ভুদার স্ত্রী) দেওয়া পান্তা ভাত খেয়ে মাঠে গেছেন। ভৈরববাঁকী নদীর ধারেই জমি, জমির কাছেই তাঁর মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি। ছেলেপিলে ছিল না, কিন্তু মজবুত বোঝাপড়ায় দুজনের সংসারে সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না সবই ছিল। দিনবদলের স্বপ্নটুকু নিয়েই তাঁদের বাঁচা।

ফসল ফলবে ক্ষেতে, তাই স্বামী-স্ত্রীর পরিশ্রমের কাজ— মুগুর দিয়ে বড় বড় ঢেলাগুলো ভাঙা। সেদিনও তাই ভাঙছেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন শম্ভুদা। ঘামছেন দরদর করে। বুকের যন্ত্রণা। বুক চেপে ধরেন দু হাত দিয়ে। তড়িঘরি ঘরের মধ্যে আসেন তাঁরা। খাটিয়ায় শুয়ে থাকতে না পেরে শম্ভুদা একবার ওঠেন একবার বসেন। সারা উঠোনময় দৌড়ে বেড়ান। জল খান। বৌদি আকুলি বিকুলি করেন। কি করবেন বুঝতে না পেরে চিৎকার করে সবাইকে ডাকেন। বাঁচা আর বাঁচানোর জন্য কী প্রয়াস দুজনের!

যারা না দেখেছেন তার কল্পনা করতে পারবেন না কী যন্ত্রণটাই না সেদিন সহ্য করতে হয়েছিল শম্ভুদাকে। অসহ্য সেই বুকের ব্যাথা বেড়েই চলেছে। বাঁচার জন্য আকাশ ফাটানো চিৎকার তাঁর। আকুতি মিনতি। কাঁথা বালিশগুলি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন তিনি। গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ দাঁড়িয়ে দেখেছেন সে দৃশ্য। গ্রামীণ ডাক্তার আসেন। ব্যথার ওষুধ দেন। প্রেশার চেক করেন। গম্ভীরভাবে জানান— প্রেশার খুব হাই, সম্ভবত হার্ট-অ্যাটাক। ব্যাথার ওষুধ খেয়ে কমেনি যন্ত্রণা, বরং বেড়েছে। ডাক্তার বলে দিলেন এ অসুখের চিকিৎসা তাঁর নাগালের বাইরে, রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

কিন্তু হাসপাতাল? সে তো ত্রি-সীমানার মধ্যে নেই। বহু বহু ক্রোশ দূরে। তবু চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি কেউ। অ্যামবুলেন্স তো দূরস্থান, নেই ট্রেকার, অটো, বাস বা ট্যাক্সি। দ্রুতগামী কোনও যানবাহন পাবার সম্ভাবনা নেই। আর সাইকেলে করে এরকম রোগীকে নিয়ে যাওয়া মানে আরও ঝুঁকি। একজন তাই সাইকেল নিয়েই ছুটল বহু ক্রোশ পেরিয়ে, ভাড়ার মোটরগাড়ি আনার জন্য।

একদিকে যা ঘটবার তাই ঘটে গেল। ঘরভর্তি উঠোনভর্তি রাস্তাভর্তি গ্রামভর্তি মানুষের সামনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন শম্ভুদা। নিথর নিঃস্পন্দ দেহ, যেন ঘুমিয়ে আছেন। গ্রামীণ ডাক্তার দেখলেন। 'ডেথ'! তখনও মোটর গাড়ির অপেক্ষায় সকলে। গাড়ি এলো। প্রাণহীন দেহটাকে তোলা হল গাড়িতে— হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। এদিকে কান্নার রোল আকাশে বাতাসে মাটিতে মিশে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

হাসপাতালের হার্ট-স্পেশলিস্ট এক ডাক্তার শম্ভুদা দেখে বলেছিলেন— হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেছেন; সময় এলে কিছু হয়ত করা যেত। দেহ ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল গ্রামে। অজস্র লোকজন রাস্তার ধারে। ফুলে ফুলে ঢেকে গেল দেহ। মানুষের কান্নার সাথে মিশে রইল শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।

পরে শম্ভুদার মৃত্যুর বিষয় নিয়ে এক হৃদরোগ- বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করা হয়।

তিনি বললেন, ''একটা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট আর একটা সরবিট্রেট ট্যাবলেটের জন্য আজ আমরা শম্ভু সোরেনের মতো মানুষকে হারালাম।'' অ্যাসপিরিন ট্যাবলেটটা খাইয়ে দিলে আর সরবিট্রেট ট্যাবলেটটা জিভের তলায় রাখলে হয়ত হাসপাতালে নিয়ে যাবার মত সময় পাওয়া যেত। সেখানে কিছু চিকিৎসার সুযোগ মিলত।

আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের তথা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মানে কী? এর উত্তর কতটা জরুরী তা বোঝা যায় এখানেই। বলতেই হয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, সচেতনতার সাথে সাথে বেঁচে থাকার জন্য বিজ্ঞান আর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের খানিকটা পরিচয় সবার পক্ষেই জরুরী।

সোমা দত্ত, বাঁকুড়া।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে প্রথম সংখ্যা ভালো লাগল

প্রিয় সম্পাদক,

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা হাতে পেলাম। রোগ-প্রতিরোধ নিয়ে সহজ সরল ভাষায় নানা লেখা নিয়ে হাজির এই পত্রিকা। স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান-বিষয়ক সাময়িকী এই পত্রিকা গুরুত্ব পাবে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে সমস্ত মানুষকে সচেতন করার প্রয়াসে। সাধু উদ্যোগ নিঃসন্দেহে। পত্রিকার পরিচালনার সাথে যুক্ত প্রায় সকলেই চিকিৎসক। এটি একটি নজির। ঝকঝকে ছাপা, প্রশংসনীয় প্রচ্ছদ, বেশ কিছু ব্যঙ্গ চিত্রে শোভিত এই সংখ্যার প্রতিটি রচনাই পাঠকদের আকর্ষণ করবে। অধিকাংশ রচনাই চিকিৎসকদের। তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন। 'দাঁতের ব্যথা' নিয়ে ডা. শর্মিষ্ঠা রায়ের লেখা ও 'জলাতঙ্ক রোগ' নিয়ে ডা. সুমিত দাশের লেখা যথেষ্ট মর্মস্পর্শী। ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্তের তদন্তনির্ভর লেখা 'কাসারগোড়-এর অভিশাপ'। কেরালার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভয়াবহ কীটনাশক এন্ডোসালফান-এর প্রভাব যে কতটা মারাত্মক এই রচনায় তা ফুটে উঠেছে।

আমাদের পরিচিত বা অপরিচিতদের মধ্যে প্রায়শই শুনি যে বুকে ব্যথা বা স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক। ডা. পার্থপ্রতিম পাল সহজ সরল ভাষায় এই বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এই রোগ হলে সহসা আতঙ্কিত না হওয়ার বিস্তারিত তথ্য আছে এই লেখায়। উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হল যে 'হার্ট অ্যাটাক হয়ে হাসপাতালে গেলে পরে' এই শিরোনামে ডা. অমিতাভ চক্রবর্তীর লেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। প্রতিটি পরিবারে এই দুই রচনার প্রতিলিপি রাখা উচিত।

গল্পের ছলে এক রোগীর কাহিনী-বর্ণনার মাধ্যমে ডা. আশীষ কুমার কুন্ডুর 'অচেনা অন্ধকারে' শিরোনামে লেখাটি এই পত্রিকার পাঠকের মনকে নাড়া দেবেই সন্দেহ নেই।

সারা পৃথিবীতে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ নিয়ে বিতর্ক চলছে। আমাদের দেশের নিরিখে এর প্রয়োজনীয়তা ও ভয়াবহতা ডা. শুভাশিস মুখোপাধ্যায় সঠিকভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

পত্রিকার সম্পাদক ডা. পুণ্যব্রত গুণ জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সদ্য প্রয়াত ডা. সুজিত কুমার দাসকে নিয়ে অসামান্য একটি লেখা লিখেছেন। যাঁরা প্রয়াত ডা. সুজিত কুমার দাসকে জানতেন না তাঁরা প্রচারবিমুখ এই মানুষটির জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের অবদানের কথা জানতে পারবেন।

ক্যানসার রোগটি এখন ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে জরায়ুমুখের ক্যানসার রোগে আক্রান্ত মহিলার সংখ্যা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ডা. চঞ্চলা সমাজদার বিস্তারিতভাবে এই রোগের খুঁটিনাটি ব্যক্ত করেছেন তাঁর রচনায়।

এই সংখ্যার মূল আকর্ষণ অবশ্যই ডা. বিনায়ক সেনের লেখা। কাজাখস্তানের 'আলমা আটা'তে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অধিবেশনের প্রতিবেদনের প্রসঙ্গে জনগণের স্বাস্থ্যের অবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশ্লেষণ করে ডা. বিনায়ক সেনের রচনাটি ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকার ২২.১১.২০০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই লেখাটির বাংলা অনুবাদ করেছেন জয়ন্ত দাস ও সুব্রত পাল। এই লেখায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাকে অনেক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

এই সংখ্যার দীর্ঘ রচনা আমেরিকায় প্রবাসী পদার্থবিদ শ্রীলা দত্ত-র তাঁর নিজের সন্তান 'রাহুল'-কে নিয়ে। এই লেখায় একজন মা তাঁর সন্তানের রোগের অসহায় অবস্থার কথা যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে মনে হয় যে তিনি নিজেই একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষক। এই লেখার শেষে তাঁর সাথে মনোভাব আদানপ্রদানের সুবিধার্থে তাঁর ই-মেল-এর উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রশংসনীয়।

পত্রিকার তৃতীয় প্রচ্ছদে জরায়ুমুখ ক্যানসারে আক্রান্ত জেড গুডি-র রঙিন ছবি ছাপা হয়েছে। এখানে যাঁর ছবি তাঁর পরিচয় থাকলে ভালো হত।

পত্রিকার দ্বিতীয় প্রচ্ছদের ব্যঙ্গ-চিত্রটি অসাধারণ। তবে পত্রিকায় কোথাও পরিচালন সমিতির সদস্যদের কোন টেলিফোন নম্বর/ ই-মেল উল্লিখিত হয়নি। এই পত্রিকার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকলে চটজলদি কিছু জানার অবকাশ নেই। বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

স্বাস্থ্যের বৃত্তের প্রথম সংখ্যা প্রত্যাশার পারদ চড়িয়ে দিয়েছে। পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকলাম।

সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী
শ্রীরামপুর-৭১২২০৪

- **চিকিৎসা ব্যক্তির অধিকার, সমষ্টির দায়িত্ব**
- **চিকিৎসা পণ্য নয়, মানবিক অধিকার**

ক্যুইজের উত্তর

১। ১৬৭৪ সালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন হল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক।

২। আয়োডিনের অভাব গলগন্ড রোগের একটা কারণ।

৩। মানুষের প্রতিদিন ৬-৮ ঘন্টা ঘুম প্রয়োজন। ঘুম না হওয়াকে বলে ইনসমনিয়া আর অস্বাভাবিক বেশি ঘুম হওয়াকে বলে হাইপারসমনিয়া।

৪। কয়েকবছর আগে টেনিস খেলোয়ার লিয়েন্ডার পেজ-র রোগটি হয়েছিল বলে মিডিয়া-র দৌলতে অনেকেই রোগটির নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। রোগটির কারণ টিনিয়া সোলিয়াম নামক পরজীবি কৃমি। যদি এই পরজীবি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে বাসা বাঁধে তাকে বলে নিউরোসিস্টিসারকোসিস।

৫। ডিপথেরিয়া, পারটুসিস বা হুপিং কাশি ও টিটেনাস— এই তিনটি রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

৬। ১৯২১ সালে ফ্রান্সের ক্যালমেটি ও গুয়ারিন এই টিকা আবিষ্কার করেন। তাঁদের নাম অনুসারে এই টিকার নাম ব্যসিলাস ক্যালমেটি গুয়েরিন।

৭। বাঁধাকপি ও ফুলকপিতে সায়ানগ্লাইকোসাইড ও থায়োসায়ানেট নামক রাসায়নিক থাকে যা থাইরয়েড গ্রন্থিতে হরমোন তৈরীতে বাধা দেয়— এজন্য এই ধরনের খাবার থাইরয়েড-র সমস্যা থাকলে খাওয়া উচিত নয়।

৮। লিনোলিক অ্যাসিডে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড। সয়াবিন, পাম, চিনাবাদাম ইত্যাদি যে কোনো উদ্ভিজ তেলে এই যৌগ প্রচুর পরিমাণে থাকে।

৯। রক্তে হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন এর মাত্রা বেশি থাকা হার্টের জন্য উপকারী।

১০। ভিটামিন এ-র অভাবে রাতকানা রোগ হয়। এই রোগ প্রতিরোধ করার জন্য শিশুদের ৬ মাস বাদ বাদ ২ লাখ ইউনিট ভিটামিন তেল খাওয়ানো উচিত।

১১। প্রতিবছর ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয়।

১২। ডায়াবিটিস মেলিটাস বা মধুমেহ রোগের লক্ষণ।

advt.

Acne, Hair Fall, Vitiligo – Do **NOT** Despair.

All are Treatable.

Consult your Dermatologist

ALKEM DERMA CARE

(Adding Value to Skin Care)

A Division of **Alkem** Laboratories Ltd